Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

ইসলামে নারীর অধিকার ও অবস্থান

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাওলানা জিল্লুর রহমান

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

শায়লা জামান তিথি

রোলঃ ২৩০৯০১২০৩০৩

২০, নভেম্বর,২০২৫ ইং

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

ইসলামে নারীর অধিকার ও অবস্থান

এই রিপোর্ট টি ইসলামিক অনালাইন মাদ্রাসার ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজের একটি আনুসাঙ্গিক রিপোর্ট।

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাওলানা জিল্লুর রহমান

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

শায়লা জামান তিথি

রোলঃ ২৩০৯০১২০৩০৩

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

প্রত্যয়ন পত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, "ইসলামে নারীর অধিকার ও অবস্থান" বিষয়ক গবেষণাপত্র টি আমার তত্ত্বাবধানে ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ ডিপার্টমেন্ট থেকে শায়লা জামান তিথি, আইডিঃ ২৩০৯০১২০৩০৩ বিচক্ষনতার সাথে সম্পন্ন করেছেন।

(স্বাক্ষর)

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাওলানা জিল্লুর রহমান
রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট।
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

(স্বাক্ষর)

এক্সটারনালঃ

মুফতি: জোবায়ের হাসান
রিসার্চ এন্ড ডেভেলপমেন্ট ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

ঘোষণাপত্র

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী এ মর্মে ঘোষণা করছি যে, " ইসলামে নারীর অধিকার ও অবস্থান " শিরোনামে এই গবেষণাপত্র ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার (Islamic Online Madrasah – IOM) ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের মাওলানা জিল্লুর রহমান উস্তাদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় সম্পন্ন করেছি। অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রি/ডিপ্লোমা অর্জনের জন্য বা প্রকাশের জন্য গবেষণাপত্র সম্পূর্ণ কিংবা এর অংশবিশেষ উপস্থাপন করা হয়নি।

আমি আরও ঘোষণা করছি যে, এই গবেষণা কর্মটি আমার নিজস্ব মৌলিক রচনা। আমার জানা মতে ইতিপূর্বে আর কোন ব্যক্তি এই শিরোনামে কোন গবেষণাপত্র রচনা করেননি।

শায়লা জামান তিথি

আইডিঃ ২৩০৯০১২০৩০৩

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা।

তারিখঃ

২০ নভেম্বর, ২০২৫ ইং

সূচিপত্র

বিষয়বস্তু	পৃষ্ঠা নম্বর
ভূমিকা	১
নারীর পরিচয়	২
ইসলামে নারীর অধিকার ও অবস্থান বলতে যা বোঝায়	৪
ইসলাম পূর্ব যুগে নারীর অধিকার ও অবস্থান	১০
১. কন্যা সন্তান জন্ম হলে পিতার প্রতিক্রিয়া	১১
২. কন্যা সন্তানকে জীবন্ত হত্যা	১২
৩. সম্মানহানি	১৩
৪. জাহিলি যুগের বিবাহ পদ্ধতি	১৪
৫. দাসীদেরকে পতিতাবৃত্তিতে বাধ্য করা	১৬
৬. পশুর মাংসে ও দুধে নারীর অনধিকার	১৭
কন্যা হিসেবে ইসলামে নারীর অধিকার	১৯
ইসলামে স্ত্রীর অধিকার ও অবস্থান	২৩
১. ভরণ-পোষণের দায়িত্ব	২৪
২. বসবাসের ব্যবস্থা:	২৬
৩. স্ত্রীর সাথে রাত্রিযাপন:	২৭
৪. স্ত্রীর সাথে সদ্ব্যবহার:	২৮
৫. মহর আদায় করা	২৮
৬. স্ত্রীকে ধর্মীয় শিক্ষা প্রদান	২৯
৭. স্ত্রীর চারিত্রিক বিষয়	৩০
৮. স্ত্রীর মান-অভিমান	৩১
৯. একাধিক বিবাহ	৩২
মা হিসেবে ইসলামে নারীর অধিকার ও অবস্থান	৩৩

১. গর্ভধারণের মর্য়াদা	৩৩
২. মাতৃত্বের মর্যাদা	৩৩
৩. মায়ের দোয়া	৩৪
ইসলামে নারীর কর্মের অধিকার ও অবস্থান	৩৪
ইসলামে নারীর অর্থনৈতিক অধিকার ও অবস্থান	৪১
নারীর সামাজিক অধিকার ও অবস্থানে ইসলাম	৪৫
১. মোহর দানের মাধ্যমে নারীর অধিকার ও মর্যাদা	৪৫
২. সহবাসের ক্ষেত্রে নারীকে অধিকার ও মর্যাদা দান	৪৬
৩. ভ্রমণের অধিকার	৪৬
৪. ইসলামে নারীর মানবিক মর্যাদা	৪৮
ইসলামে নারীর শিক্ষার অধিকার	৪৯
১. ইসলামের দৃষ্টিতে নারী শিক্ষার গুরুত্ব	৪৯
অন্যান্য ধর্মে নারীর অধিকার ও অবস্থা	৫৩
ইসলাম নারীর নিরাপত্তা দাতা	৫৮
জান্নাতের সুসংবাদ প্রাপ্ত নারিদের অবস্থান	৬২
১. খাদিজা বিনতু খুয়াইলিদ	৬৩
২. ফাতিমা বিনতু মুহাম্মাদ	৬৪
৩. আসিয়া বিনতু মুযাহিম	৬৪
৪. মারইয়াম ইবনাতু ইমরান	৬৫
ইসলামে বিধবা ও তালাকপ্রাপ্ত নারীর অধিকার ও অবস্থান	৬৬
মুসলিম নারীর সর্তকতা	৬৯
উপসংহার	৭১
তথ্যসূত্র	৭২

بسم الله الرحمن الرحيم

ভূমিকা

আল্লাহ সুবহানাতায়ালা মানুষকে সর্বোচ্চ সম্মানিত করে আশরাফুল মাখলুকাত হিসেবে সৃষ্টি করেছেন।

قال تعالى: " لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم"

অন্য সকল প্রাণী চার পায়ে চলাফেরা করে এবং মুখ দিয়ে খাবার খায়। কিন্তু আল্লাহ তায়ালা মানুষকে শ্রেষ্ঠ বানিয়ে দুই পায়ে চলার তৌফিক দিয়েছেন। হাত দিয়ে খাবার মুখে তুলে খেতে শিখিয়েছেন এবং সর্বোচ্চ জ্ঞান দান করেছেন। **মানুষ** অন্য সকল প্রণীর ওপরে আধিপত্য বিস্তার করতে পারে। নর ও নারীর সমন্বয়ে মানব সমাজ গঠিত। এর মাঝে ইসলামে গঠন ও আকৃতির দিক হতে নর-নারীর ভিন্নতা পরিলক্ষিত হলেও মর্যাদার দিক হতে, অধিকার ও অবস্থানের দিক হতে, উভয়কেই প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে। মহান রাব্বুল আলামিনের কাছে সবচেয়ে পছন্দের বিষয় একজন মুমিন মুমিনার তাকওয়া।

قال تعالى: "إن أكرمكم عند الله أتقاكم"

এখানে কে পুরুষ কে মহিলা এর কোন ভেদাভেদ নেই। একমাত্র ইসলামী পরিপূর্ণ জীবন ব্যবস্থা যেখানে নারীর প্রত্যেকটি অবস্থানের ভিত্তিতে নারীকে দেওয়া হয়েছে পরিপূর্ণ স্থান ও সুমহান মর্যাদা। ইসলাম আগমনের পরেই নারী পেয়েছে তার পূর্ণাঙ্গ অধিকার ও অবস্থান, এর ফলে নির্যাতিত নিপীড়িত অবহেলিত নারী সমাজ পেয়েছে মুক্তির সন্ধান। এর অধিকার দুনিয়াতেই সীমাবদ্ধ নয়, আল্লাহ নারীদের জন্য আখিরাতেও রেখেছে মহা পুরস্কার। কোরআন এ অসংখ্য আয়াত নাজিল করা হয়েছে নারীর অধিকার ও অবস্থান সম্পর্কে। একটি পরিপূর্ণ সূরা নাযিল হয়েছে পবিত্র কোরআনে শুধুমাত্র নারীর অধিকার, হক, এবং আরো কিছু বিবিধ মাসালা মাসায়েল নিয়ে। শেষ নবী ও রাসুল নিজেও নারীদের ব্যাপারে ও তাদের আত্মমর্যাদা, হক, সামাজিক মর্যাদা, পারিবারিক অবস্থান, দুনিয়া ও আখিরাতের কল্যাণ ইত্যাদি বিষয় নিয়ে অসংখ্য হাদিস রচনা করেছেন।

নারীকে ইসলাম ধর্মে যে রূপ মর্যাদায় অধিষ্ট করা হয়েছে তা আর অন্য কোন ধর্মে করা হয়নি। সকল ধর্মের নারীদেরকে শুধু পণ্য হিসেবে দেখা হয় অথবা তাদেরকে অবহেলা বঞ্চনা দেওয়া হয়। ইসলামই একমাত্র পূর্ণাঙ্গ এবং সত্য ধর্ম যেখানে নারিকে দেয়া হয়েছে পরিপূর্ণ অধিকার ও সম্মানিত অবস্থান।

নারীর পরিচয়

নারীকে আল্লাহ তায়ালা পুরুষের অর্ধাঙ্গিনী রূপে সৃষ্টি করেছেন। আল্লাহ তা'আলা নারীকে পুরুষ হতে সৃষ্টি করেছেন। সর্বপ্রথম যখন আদম আলাইহি সাল্লামকে সৃষ্টি করা হয় তখন উনাকে জান্নাতে রাখা হয়। জান্নাতে তিনি একাকীত্ব অনুভব করলে আল্লাহ তাআলা তার সঙ্গিনী রূপে হাওয়া আলাইহিস সালামকে সৃষ্টি করেছেন। এরপর থেকেই নারী পুরুষ এর জন্ম বিস্তার লাভ করে। আল্লাহ তায়ালা নারীকে পুরুষ হতে সৃষ্টি করেছেন, যেন তারা একে অপরের প্রতি সুসম্পর্ক, দয়ামায়া, অনুগ্রহ, প্রেম-ভালবাসা ইত্যাদির সৃষ্টি করে।

আল্লাহ তাআলা বলেনঃ

“হে মানুষ তোমরা তোমাদের রব কে ভয় করো যিনি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন এক নফস থেকে আর তা থেকে সৃষ্টি করেছেন তার স্ত্রীকে এবং তাদের থেকে ছড়িয়ে দিয়েছেন বহু পুরুষ ও নারী”

(সূরা আন নিসা আয়াত-১)

আল্লাহ তাআলা আরো বলেন

وَ مِنۡ اٰیٰتِہٖۤ اَنۡ خَلَقَ لَکُمۡ مِّنۡ اَنۡفُسِکُمۡ اَزۡوَاجًا لِّتَسۡکُنُوۡۤا اِلَیۡہَا وَ جَعَلَ بَیۡنَکُمۡ مَّوَدَّۃً وَّ رَحۡمَۃً ؕ اِنَّ فِیۡ ذٰلِکَ لَاٰیٰتٍ لِّقَوۡمٍ یَّتَفَکَّرُوۡنَ ﴿۲۱﴾

“আর তাঁর নিদর্শনাবলীর মধ্যে রয়েছে যে, তিনি তোমাদের জন্য তোমাদের মধ্য থেকে সৃষ্টি করেছেন তোমাদের জোড়া; যাতে তোমরা তাদের কাছে শান্তি পাও, এবং সৃষ্টি করেছেন তোমাদের মধ্যে ভালবাসা ও সহমর্মিতা। নিশ্চয় এতে বহু নিদর্শন রয়েছে সে সম্প্রদায়ের জন্য, যারা চিন্তা করে”

(সুরা রুম আয়াত-২১)

মানুষের মধ্য থেকে আল্লাহ তাআলা নারী জাতিকে সৃষ্টি করেছেন। তারা পুরুষের সংগিনী হয়েছে। [ইবন কাসীর] হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, “তোমাদের মধ্যে যে কেউ আল্লাহ ও শেষ দিবসে ঈমান রাখবে সে যেন তার পড়শীকে কষ্ট না দেয়। আর তোমরা মহিলাদের প্রতি কল্যাণকর হওয়ার ব্যাপারে পরস্পরকে উপদেশ দাও; কেননা তারা বাঁকা হাড় থেকে সৃষ্টি হয়েছে। সবচেয়ে বাঁকা অংশ হচ্ছে হাড়ের উপরের অংশ। যদি তুমি তাকে সোজা করতে যাও তবে তা ভেঙ্গে ফেলবে। পক্ষান্তরে যদি তুমি ছেড়ে যাও তবে সব সময় বাঁকাই থেকে যাবে। সুতরাং তোমরা মহিলাদের প্রতি কল্যাণকর হওয়ার ব্যাপারে পরস্পরকে উপদেশ দাও।

[বুখারী: ৫১৮৫, ৫১৮৬]

ইবন কাসীর বলেন, এর অর্থ তোমাদের স্বজাতি থেকে তোমাদের জন্য স্ত্রীর ব্যবস্থা করেছেন। যাতে তোমাদের মধ্যে প্রশান্তি আসে। যেমন অন্য আয়াতে বলেছেন, “তিনিই তোমাদেরকে এক ব্যক্তি থেকে সৃষ্টি করেছেন ও তার থেকে তার স্ত্রী সৃষ্টি করেছেন, যাতে সে তার কাছে শান্তি পায়।”

[সূরা আল-আরাফ: ১৮৯]

এখানে নারী জাতি সৃষ্টি করার রহস্য ও উপকারিতা বর্ণনা প্রসঙ্গে বলা হয়েছেঃ অর্থাৎ তোমরা তাদের কাছে পৌঁছে শান্তি লাভ কর, এ কারণেই তাদেরকে সৃষ্টি করা হয়েছে।

পুরুষদের যত প্রয়োজন নারীর সাথে সম্পৃক্ত সবগুলো সম্পর্কে চিন্তা করলে দেখা যাবে যে, সবগুলোর সারমর্ম হচ্ছে মানসিক শান্তি ও সুখ।

[আদওয়াউল বায়ান; সাদী]

নারীকে আল্লাহ তা'আলা এমন কিছু গুণ দিয়েছেন যা পুরুষকে দেননি, আবার পুরুষের গুণাবলী নারীকে দেননি। নারী সময় স্থান-কাল প্রেক্ষাপট ও অবস্থা ভেদে পরিবর্তনশীল। একজন নারী মা হয়, কোমল মমতাময়ী ও দুর্বল হয়। স্ত্রী হলে প্রিয়তমা ও যত্নশীল হয়, নারীর মন অত্যাধিক নরম। একজন নারীকে খুশি করা যেমন খুব সহজ তেমন তাকে কষ্ট দেয়া খুব সহজ। তার হাসি কান্না সবই ক্ষণস্থায়ী। একজন নারীর অবস্থা পরিবর্তিত হয়, মাসিক হয়, গর্ভধারণ করে, সন্তান প্রসব করে, তার বাচ্চাদের দুধ পান করায়, বাচ্চাদের লালন পালন করে, এগুলো নারীদের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। যা কিনা একজন পুরুষের মাঝে নেই। আল্লাহ সুবহানাতায়ালা এই বৈশিষ্ট্যগুলো দানের মাধ্যমে একজন নারীকে পুরুষ থেকে ভিন্নতা ও মনের দিক দিয়ে কোমলতা দান করেছেন।

ইসলামে নারীর অধিকার ও অবস্থান বলতে যা বোঝায়

ইসলামই একমাত্র ধর্ম, যেখানে নারীদেরকে সমস্ত অসম্মান ও অবমাননা থেকে মুক্ত করে আলোর পথে অগ্রসর করেছে। ইসলাম নারীকে দিয়েছে নিরাপত্তা, সম্ভ্রম রক্ষার নিশ্চয়তা, সামাজিক ও অর্থনৈতিক অধিকার। দুনিয়া ও আখিরাতের সকল সাফল্য অর্জনের অধিকার—সমস্ত পথ একজন নারীর জন্য খোলা। সকল প্রকার ফিতনা, ফ্যাসাদ, অন্যায় ও অত্যাচার হতে নারীদেরকে সুরক্ষা দান করেছে ইসলাম। আল্লাহ

তা'আলা নারী জাতির প্রতি অসীম দয়ালু ও নিষ্ঠাবান। নারীর প্রত্যেকটি হকের প্রতি তিনি সহানুভবশীল ও ন্যায়বিচারক। নারীদের জন্য ইসলাম এক অন্যতম নিয়ামত, যার ছায়া তাদের শুধুমাত্র কল্যাণ আর কল্যাণ দেয়। ইসলামই একমাত্র নারীর আশ্রয়স্থল। ইসলাম সমাজকে সকল প্রকার অন্যায়, অত্যাচার, নির্যাতন, নিপীড়ন, শ্রেণী বৈষম্য, কুসংস্কার ও কূপ্রথা হতে মুক্ত করেছে। একটি ঝিনুকের ভেতরে মুক্তা যেমন সুরক্ষিত অবস্থায় থাকে, ইসলামের মাঝে নারীর সুরক্ষা ঠিক সেই রূপ। একটি সর্বোত্তম জাতি গঠন সম্ভব শুধুমাত্র ইসলামের মাধ্যমে।

সমাজে বিভিন্ন ফিতনা-ফাসাদ এর কারণ হলো নারী, কিন্তু ইসলাম নারীকে এই সকল বিষয় থেকে দূরে রেখেছে। ইসলাম তাকে ঘরের ভেতরে অবস্থান করতে বলেছে, যাতে করে সমাজে ব্যভিচার সংঘটিত না হয়। নারীদের অবাধ চলাফেরা, পুরুষ ও নারীর অবাধ মেলামেশা, লজ্জা-শরম না থাকা ও বেপর্দা চলাফেরা করার জন্য সমাজে বিভিন্ন ফিতনা-ফাসাদের সৃষ্টি হয়। নারীদের অবাধ চলাফেরার জন্য সমাজে ব্যভিচার ঘটে, সমাজের শান্তি শৃঙ্খলা বিনষ্ট হয়। এগুলো সমাজের বৃহত্তর আজাব। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা সমাজকে এই আজাবের হাত থেকে রক্ষা করার জন্য নারীদেরকে নিজ ঘরে অবস্থান করা এবং পর্দার বিধান দিয়েছেন। জাহিলিয়াতের যুগের নারীদের মত নিজেদের সৌন্দর্য বর্ধন করে বিচরণ করতে নিষেধ করেছেন।

আল্লাহ তাআলা বলেনঃ

يٰنِسَآءَ النَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَاَحَدٍ مِّنَ النِّسَآءِ اِنِ اتَّقَيْتُنَّ فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِىْ فِىْ قَلْبِهٖ مَرَضٌ وَّ قُلْنَ قَوْلًا مَّعْرُوْفًا ﴿٣٢﴾

“হে নবী-পত্নীগণ! তোমরা অন্য নারীদের মত নও; যদি তোমরা আল্লাহকে ভয় কর, তবে পরপুরুষের সাথে কোমল কণ্ঠে এমনভাবে কথা বলো না, যাতে অন্তরে যার ব্যাধি আছে সে প্রলুব্ধ হয়। আর তোমরা সদালাপ কর। (স্বাভাবিকভাবে কথা বল।)”

(সূরা আহাজাব আয়াত-৩২)

অর্থাৎ, তোমাদের বৈশিষ্ট্য ও মর্যাদা সাধারণ নারীদের মত নয়; বরং আল্লাহ তাআলা তোমাদেরকে রসূল-পত্নী হওয়ার সৌভাগ্য দান করেছেন, যার ফলে তোমরা এক উচ্চস্থান ও মর্যাদার অধিকারিণী, তাই রসূল (সাঃ)-এর মত তোমাদেরকেও উম্মতের জন্য আদর্শবতী হতে হবে। এখানে নবী-পত্নীগণকে তাঁদের উচ্চস্থান ও মর্যাদার কথা স্মরণ করিয়ে তাঁদেরকে কিছু নির্দেশ দান করা হচ্ছে। এ সব নির্দেশাবলীতে সম্বোধন যদিও পবিত্রা স্ত্রীগণকে করা হয়েছে, যাঁদের প্রত্যেককে 'উম্মুল মু'মিনীন' (মু'মিনদের মাতা) বলা হয়েছে, তবুও বর্ণনা ভঙ্গীতে প্রকাশ পাচ্ছে যে, উদ্দেশ্য সমগ্র মুসলিম নারীকে বোঝানো ও সতর্ক করা। অতএব উক্ত নির্দেশাবলী সমগ্র মুসলিম নারীর জন্য মান্য ও পালনীয়।

আল্লাহ তাআলা যেরূপভাবে নারী জাতির দেহ-বৈচিত্রে পুরুষের জন্য যৌন আকর্ষণ সৃষ্টি করেছেন (যা থেকে হেফাযতের বিশেষ নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যাতে নারী পুরুষের জন্য ফেতনার কারণ না হয়ে পড়ে।) অনুরূপভাবে তিনি নারীদের কন্ঠস্বরেও প্রকৃতিগতভাবে মন কেড়ে নেওয়ার ক্ষমতা, কোমলতা ও মধুরতা রেখেছেন, যা পুরুষকে নিজের দিকে আকর্ষণ করতে থাকে। সুতরাং সেই কন্ঠস্বর ব্যবহার করার ব্যাপারেও এই নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে, পরপুরুষের সাথে বাক্যালাপের সময় ইচ্ছাপূর্বক এমন কন্ঠ ব্যবহার করবে, যাতে কোমলতা ও মধুরতার পরিবর্তে সামান্য শক্ত ও কঠোরতা থাকে। যাতে ব্যাধিগ্রস্ত অন্তরবিশিষ্ট লোক কন্ঠের কোমলতার কারণে তোমাদের দিকে আকৃষ্ট না হয়ে পড়ে এবং তাদের মনে কুবাসনার সঞ্চার না হয়।

অর্থাৎ, এই কর্কশতা ও কঠোরতা শুধু কন্ঠস্বরের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকবে, অর্থাৎ মুখে এমন বাক্য আনবে না, যা অসঙ্গত ও সচ্চরিত্রতার পরিপন্থী। إِنِ اتَّقَيْتُنَّ (যদি তোমরা আল্লাহকে ভয় কর) বলে আল্লাহ তাআলা ইঙ্গিত করেছেন যে, এই কথা এবং অন্যান্য নির্দেশাবলী যা সামনে বর্ণনা করা হবে, তা মুত্তাক্বী নারীদের জন্য (যারা আল্লাহকে ভয় করে)। কারণ তাদেরই আশঙ্কা থাকে যে, যাতে তাদের আখেরাত বরবাদ না হয়ে যায়।

পক্ষান্তরে যাদের হৃদয় আল্লাহর ভয়শূন্য তাদের সাথে এই নির্দেশাবলীর কোন সম্পর্ক নেই। তারা কখনোও এর পরোয়া করবে না।

আল্লাহ তাআলা আরো বলেনঃ

وَ قَرْنَ فِیْ بُیُوْتِكُنَّ وَ لَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِیَّةِ الْاُوْلٰى وَ اَقِمْنَ الصَّلٰوةَ وَ اٰتِیْنَ الزَّكٰوةَ وَ اَطِعْنَ اللّٰهَ وَ رَسُوْلَهٗؕ اِنَّمَا یُرِیْدُ اللّٰهُ لِیُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ اَهْلَ الْبَیْتِ وَ یُطَهِّرَكُمْ تَطْهِیْرًا ﴿۳۳﴾

“তোমরা স্বগৃহে অবস্থান কর, এবং (প্রাক-ইসলামী) জাহেলী যুগের মত নিজেদেরকে প্রদর্শন করে বেড়িয়ো না। তোমরা নামায প্রতিষ্ঠা কর ও যাকাত প্রদান কর এবং আল্লাহ ও তাঁর রসূলের অনুগতা হও; হে নবী-পরিবার! আল্লাহ তো কেবল তোমাদের মধ্য থেকে অপবিত্রতা দূর করতে চান এবং তোমাদেরকে সম্পূর্ণরূপে পবিত্র করতে চান”

(সূরা আহাজাব আয়াত-৩৩)

অর্থাৎ, তোমরা ঘরে অবস্থান কর এবং প্রয়োজন ছাড়া ঘর থেকে বাইরে যেও না। এতে পরিষ্কার করে দেওয়া হয়েছে যে, নারীদের কর্ম রাজনীতি, দুনিয়া পরিচালনা ও পরিশ্রম-উপার্জন করা নয়। বরং তাদের প্রধান কাজ হল, ঘরের চার দেওয়ালের মাঝে সুরক্ষিত থেকে গৃহকর্ম দেখাশোনা করা।

এখানে নারীদের ঘর থেকে বের হওয়ার আদব বর্ণনা করে দেওয়া হয়েছে যে, যদি প্রয়োজনে বাড়ি থেকে বের হতে হয়, তবে তোমরা যেন সাজসজ্জা করে বাইরে না যাও কিংবা এমনভাবে বের না হও, যাতে তোমাদের সৌন্দর্য প্রকাশ পায়। যেমন বেপর্দা হয়ে এমনভাবে বের না হও, যাতে তোমাদের মাথা, চেহারা, ঘাড় ও বুক ইত্যাদি পুরুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। বরং সুগন্ধি ব্যবহার না করে সাধারণ পোশাকে আবৃত হয়ে পর্দার সাথে বের হবে। ‘تبرج’ এর অর্থ হল বেপর্দা হওয়া, সৌন্দর্য প্রকাশ ও প্রদর্শন করা। কুরআন এ কথা স্পষ্ট করে দিয়েছে যে, ‘تَبَرُّجْ (পর্দাহীনতা) হল জাহেলী যুগের প্রথা; যা ইসলামের পূর্বে ছিল এবং ভবিষ্যতে যখন তা বেছে নেওয়া হবে, তখন তা জাহেলী প্রথাই গণ্য হবে। তার সাথে ইসলামের কোন সম্পর্ক নেই, তাতে তার নাম

যতই সুন্দর ও মনলোভা (নারী-স্বাধীনতা, নারী-প্রগতি, সভ্যতা ইত্যাদি) রাখা হোক না কেন।

পূর্বের নির্দেশগুলি পাপকর্ম থেকে দূরে থাকার ব্যাপারে ছিল। এই সকল নির্দেশাবলী পুণ্যকর্ম বেছে নেওয়ার ব্যাপারে দেওয়া হচ্ছে।

ইসলাম নারীদের জন্য যে সকল নীতিমালা প্রণয়ন করেছেন, তা মানুষের জন্য কল্যাণকর। নারীরা যেন কোনো অন্যায় ও অশ্লীল কাজে অগ্রসর না হয়, নিরাপত্তাহীনতায় না ভুগে, তাই ইসলাম নারীর চলাফেরায় কিছু নিয়ম-নীতি প্রণয়ন করেছেন। পশ্চাত্যরা বা অন্য ধর্মাবলম্বীরা বলে, ইসলাম নারীকে ঘরকুনো করে রেখেছে; কিন্তু এর মূল উদ্দেশ্য হলো সমাজের শান্তি শৃঙ্খলা, নারীর নিরাপত্তা ও নারীকে সুরক্ষিত রাখা। আল্লাহ তা'আলা নারী ও পুরুষের জন্য আলাদা আলাদা নীতিমালা প্রয়োগ করেছেন। এগুলো মান্য করলে দুনিয়া ও আখিরাত উভয় স্থানে সুখী হওয়া যায়।

উসামা ইবন যায়েদ (রাদিয়াল্লাহু আনহুর) হতে বর্ণিত, রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন:

"আমার পর পুরুষদের জন্য নারীদের ফিতনার চেয়ে মারাত্মক ক্ষতিকর আর কোনো ফিতনা আমি রেখে যাই নি।" (সহীহ বুখারী, হাদিস ৬০৯৬; মুসলিম, ২৭৪)

আল্লাহ তাআলা বলেন

وَ قُلْ لِّلْمُؤْمِنٰتِ يَغْضُضْنَ مِنْ اَبْصَارِهِنَّ وَ يَحْفَظْنَ فُرُوْجَهُنَّ وَ لَا يُبْدِيْنَ زِيْنَتَهُنَّ اِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَ لْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلٰى جُيُوْبِهِنَّ ۪ وَ لَا يُبْدِيْنَ زِيْنَتَهُنَّ اِلَّا لِبُعُوْلَتِهِنَّ اَوْ اٰبَآئِهِنَّ اَوْ اٰبَآءِ بُعُوْلَتِهِنَّ اَوْ اَبْنَآئِهِنَّ اَوْ اَبْنَآءِ بُعُوْلَتِهِنَّ اَوْ اِخْوَانِهِنَّ اَوْ بَنِيْٓ اِخْوَانِهِنَّ اَوْ بَنِيْٓ اَخَوٰتِهِنَّ اَوْ نِسَآئِهِنَّ اَوْ مَا مَلَكَتْ اَيْمَانُهُنَّ اَوِ التّٰبِعِيْنَ غَيْرِ اُولِي الْاِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ اَوِ الطِّفْلِ الَّذِيْنَ لَمْ يَظْهَرُوْا عَلٰى عَوْرٰتِ النِّسَآءِ ۪ وَ لَا يَضْرِبْنَ بِاَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِيْنَ مِنْ زِيْنَتِهِنَّ ؕ وَ تُوْبُوْٓا اِلَى اللّٰهِ جَمِيْعًا اَيُّهَ الْمُؤْمِنُوْنَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ ﴿٣١﴾

“বিশ্বাসী নারীদেরকে বল, তারা যেন তাদের দৃষ্টিকে সংযত করে ও তাদের লজ্জাস্থান রক্ষা করে। তারা যা সাধারণতঃ প্রকাশ থাকে তা ব্যতীত, তাদের সৌন্দর্য যেন প্রদর্শন

না করে, তারা তাদের বক্ষঃস্থল যেন মাথার কাপড় দ্বারা আবৃত রাখে। তারা যেন তাদের স্বামী, পিতা, শ্বশুর, পুত্র, স্বামীর পুত্র, ভ্রাতা, ভ্রাতুষ্পুত্র, ভগিনী পুত্র, তাদের নারীগণ, নিজ অধিকারভুক্ত দাস, যৌনকামনা-রহিত পুরুষ অথবা নারীদের গোপন অঙ্গ সম্বন্ধে অজ্ঞ বালক ব্যতীত কারও নিকট তাদের সৌন্দর্য প্রকাশ না করে। আর তারা যেন এমন সজোরে পদক্ষেপ না করে, যাতে তাদের গোপন আভরণ প্রকাশ পেয়ে যায়। হে বিশ্বাসীগণ! তোমরা সকলে আল্লাহর দিকে প্রত্যাবর্তন কর, যাতে তোমরা সফলকাম হতে পার”

যদিও মহিলারা দৃষ্টি সংযত রাখা ও গুপ্তাঙ্গের হিফাযত করার প্রথম আদেশেই শামিল, যা ব্যাপকভাবে সকল মু’মিনদেরকে দেওয়া হয়েছে; যেহেতু মু’মিন মহিলারাও ব্যাপকার্থে মু’মিনদেরই অন্তর্ভুক্ত। তবুও এখানে বিষয়টির গুরুত্বের প্রতি লক্ষ্য রেখে বিশেষভাবে মহিলাদেরকেও দ্বিতীয়বার সেই একই আদেশ দেওয়া হচ্ছে। যার উদ্দেশ্য হল তাকীদ ও গুরুত্ব আরোপ।

‘যা সাধারণতঃ প্রকাশ থাকে’ বলতে এমন সৌন্দর্য (বাহ্যিক আভরণ) বা দেহের অংশকে বুঝানো হয়েছে যা পর্দা বা গোপন করা অসম্ভব। যেমন কোন জিনিস নিতে বা দিতে গিয়ে হাতের করতল, অথবা কিছু দেখতে গিয়ে চোখ গোপন করা সহজ নয়। অনুরূপভাবে হাতের মেহেন্দী, আঙ্গুলের আংটি, চোখের সুর্মা, কাজল, অথবা পরিহিত সৌন্দর্যময় পোশাককে ঢাকার জন্য যে বোরকা বা চাদর ব্যবহার করা হয়, তাও এক প্রকার সৌন্দর্যের অন্তর্ভুক্ত; যা গোপন করা অসম্ভব। অতএব এই সব আভরণের প্রকাশ প্রয়োজন মত দরকার সময়ে বৈধ।

সৌন্দর্য বলতে এমন পোশাক ও অলংকার বোঝায় যা মহিলারা নিজেদের রূপ-সৌন্দর্য বৃদ্ধির জন্য ব্যবহার করে থাকে। যে সৌন্দর্য একমাত্র স্বামীদের জন্য ব্যবহার করতে উদ্বুদ্ধ করা হয়েছে। সুতরাং নারীর পোশাক ও অলংকারের সৌন্দর্য প্রকাশ যদি অন্য পুরুষের সামনে নিষিদ্ধ হয়, তাহলে দেহের কোন অংশ খুলে প্রদর্শন করা ইসলামে কেমন

করে অনুমতি থাকতে পারে? এ তো অধিকরূপে হারাম তথা নিষিদ্ধ হবে। যাতে মাথা ঘাড়, গলা ও বুকের পর্দা হয়ে যায়। কারণ এ সমস্ত অঙ্গ খুলে রাখার অনুমতি নেই।

এখানে সেই সৌন্দর্য বা প্রসাধন এগানা পুরুষদের সামনে প্রকাশ করা বৈধ বলা হচ্ছে, যা ইতিপূর্বে বেগানা পুরুষদের সামনে প্রকাশ করা নিষিদ্ধ বলা হয়েছে। অর্থাৎ, পোশাক, অলংকার ও প্রসাধন ইত্যাদির সৌন্দর্য যা চাদর বা বোরকার নিচে গুপ্ত থাকে। এখানে এ মর্মে ব্যতিক্রমধর্মী বর্ণনা এসেছে যে, অমুক অমুক ব্যক্তির সামনে প্রকাশ করা বৈধ হবে।

এদের মধ্যে সবার শীর্ষে হল স্বামী। সেই জন্য স্বামীকে সবার আগে উল্লেখ করা হয়েছে। কারণ স্ত্রীর সকল শোভা- সৌন্দর্য একমাত্র স্বামীর জন্যই নির্দিষ্ট। আর স্বামীর জন্য স্ত্রীর সারা দেহ (দেখা ও ছোঁয়া) বৈধ। (যেহেতু স্বামী-স্ত্রী একে অপরের লেবাস।)

ইসলাম পূর্ব যুগে নারীর অধিকার ও অবস্থান

ইসলাম পূর্ব যুগে নারীরা ছিল নির্যাতিত, নিষ্পেষিত, অবহেলিত ও বঞ্চিত। নারীদেরকে তখন মানুষ হিসেবে নয়, পণ্যের মতো ব্যবহার করা হতো। এ সময় বিবাহ ব্যবস্থার বিলুপ্তি ঘটে; সুখ-শান্তির অনুভব স্বামী-স্ত্রীর অন্তর হতে চলে যায়। নারী নির্যাতনের মাত্রা ও পুরুষদের দাম্ভিকতা ও আধিপত্য সে সময় বিস্তার লাভ করে। পুরুষরা নারীদের সাথে জন্তু-জানোয়ারের মতো ব্যবহার করত। সময়ে-অসময়ে নারীদের সম্ভ্রম-ইজ্জত নিয়ে জৈবিক কর্মকাণ্ডে লিপ্ত থাকত। নারীরা ছিল শুধুমাত্র ভোগ্য পণ্য আর কিছু নয়। নারীদেরকে শুধু বংশবিস্তার ও পুরুষের সেবার জন্য ব্যবহার করা হতো।

১. কন্যা সন্তান জন্ম হলে পিতার প্রতিক্রিয়া

কন্যা সন্তান জন্মের খবর শুনলে পিতার মুখমণ্ডল লজ্জায় বিবর্ণ হয়ে যেত। সমাজে কীভাবে মুখ দেখাবেন, তা ভেবে নিজের প্রতি নিজের ক্রোধ জন্মাত...এ সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেন:

وَ اِذَا بُشِّرَ اَحَدُهُمۡ بِالۡاُنۡثٰی ظَلَّ وَجۡهُهٗ مُسۡوَدًّا وَّ هُوَ كَظِيۡمٌ ﴿۵۸﴾

يَتَوَارٰی مِنَ الۡقَوۡمِ مِنۡ سُوۡٓءِ مَا بُشِّرَ بِهٖ ؕ اَيُمۡسِكُهٗ عَلٰی هُوۡنٍ اَمۡ يَدُسُّهٗ فِی التُّرَابِ ؕ اَلَا سَآءَ مَا يَحۡكُمُوۡنَ ﴿۵۹﴾

“তাদের কাউকে যখন কন্যা-সন্তানের সুসংবাদ দেওয়া হয়, তখন তার মুখমন্ডল কাল হয়ে যায় এবং সে অসহনীয় মনস্তাপে ক্লিষ্ট হয়। তাকে যে সুসংবাদ দেয়া হয়, তার গ্লানির কারণে সে নিজ সম্প্রদায় হতে আত্মগোপন করে। সে চিন্তা করে হীনতা সত্বেও কি তাকে রেখে দেবে, নাকি মাটিতে পুঁতে ফেলবে। সাবধান! তারা যা সিদ্ধান্ত করে তা কত নিকৃষ্ট”

(সূরা আন-নাহাল ৫৮-৫৯)

وَ اِذَا بُشِّرَ اَحَدُهُمۡ بِمَا ضَرَبَ لِلرَّحۡمٰنِ مَثَلًا ظَلَّ وَجۡهُهٗ مُسۡوَدًّا وَّ هُوَ كَظِيۡمٌ ﴿۱۷﴾

“ওরা পরম দয়াময় আল্লাহর প্রতি যে কন্যা-সন্তান আরোপ করে, ওদের কাউকেও সে কন্যা সন্তানের সংবাদ দেওয়া হলে তার মুখমন্ডল কালো হয়ে যায় এবং সে অসহনীয় মনস্তাপে ক্লিষ্ট হয়”

(সূরা আয-যুখরুফ ১৭)

কন্যা জন্মের সংবাদ শুনে তাদের এই অবস্থা হয়, যা বর্ণিত হয়েছে, অথচ আল্লাহর জন্য তারা কন্যা নির্ধারণ করে। তাদের সিদ্ধান্ত কতই না অসঙ্গত। অবশ্য এখানে এটা ভাবা উচিত নয় যে, মহান আল্লাহও পুত্রের তুলনায় কন্যাকে তুচ্ছ মনে করেন। না, আল্লাহর নিকট পুত্র-কন্যার মধ্যে কোন পার্থক্য নেই, আর না লিঙ্গ বা জাতিভেদের দিক দিয়ে তুচ্ছ বা মর্যাদাসম্পন্ন করার কোন ব্যাপার আছে। এখানে শুধুমাত্র আরবদের একটি

অন্যায় ও গর্হিত রীতিকে স্পষ্ট করাই আসল উদ্দেশ্য। যা তারা আল্লাহর ব্যাপারে পোষণ করত; যদিও তারাও আল্লাহর সম্মান ও বড়ত্বকে স্বীকার করত। যার যুক্তিসঙ্গত ফল এই ছিল যে, যে জিনিস তারা নিজেদের জন্য পছন্দ করে না, সেটিকে আল্লাহর জন্যও নির্ধারণ করবে না। কিন্তু তারা তার বিপরীত করল। এখানে শুধু এই অন্যায় আচরণকেই স্পষ্ট করা হয়েছে।

২. কন্যা সন্তানকে জীবন্ত হত্যা

সামাজিকভাবে নিচু ও অসম্মানের ভয়ে পিতা কন্যা সন্তান জন্ম হলে, তার কন্যা সন্তানকে জীবন্ত কবর দিত। এ ছিল অন্যতম ও সর্বাধিক নিম্ন, জঘন্যতম কাজ। এ সম্পর্কে কোরআনে বর্ণিত হয়েছে:

بِاَیِّ ذَنۡۢبٍ قُتِلَتۡ ۚ﴿۹﴾ وَ اِذَا الۡمَوۡءٗدَۃُ سُئِلَتۡ ۚ﴿۸﴾

“যখন জীবন্ত-প্রোথিতা কন্যাকে জিজ্ঞেস করা হবে, কোন্ অপরাধে তাকে হত্যা করা হয়েছিল?”

(সূরা তাকভীর ৮-৯)।

শুধুমাত্র সামাজিক অপমান ও গ্লানি নয়, তারা অর্থ সংকটের ভয়ও কন্যা সন্তানদেরকে জীবন্ত হত্যা করত, মাটি চাপা দিত। এ ছিল প্রত্যেকটি পরিবারের একটি নিত্য-নৈমিত্তিক বর্বরতা। তারা ভাবত, কন্যা সন্তানকে পালন করলে শুধুমাত্র অর্থ ব্যয় হবে, এর ফলে দারিদ্রতা নেমে আসবে। এই কন্যা সন্তান তো কোনো অর্থনৈতিকভাবে লাভের কিছু বয়ে নিয়ে আসবে না, ভবিষ্যৎ জীবনে এই সন্তান তো কোনো উপার্জন করবে না।

قُلۡ تَعَالَوۡا اَتۡلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمۡ عَلَيۡكُمۡ اَلَّا تُشۡرِكُوۡا بِهٖ شَيۡـًٔا وَّ بِالۡوَالِدَيۡنِ اِحۡسَانًا‌ ۚ وَ لَا تَقۡتُلُوۡۤا اَوۡلَادَكُمۡ مِّنۡ اِمۡلَاقٍ‌ ؕ نَحۡنُ نَرۡزُقُكُمۡ وَ اِيَّاهُمۡ‌ ۚ وَ لَا تَقۡرَبُوا الۡفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنۡهَا وَ مَا بَطَنَ‌ ۚ وَ لَا تَقۡتُلُوا النَّفۡسَ الَّتِىۡ حَرَّمَ اللّٰهُ اِلَّا بِالۡحَقِّ‌ ؕ ذٰلِكُمۡ وَصّٰىكُمۡ بِهٖ لَعَلَّكُمۡ تَعۡقِلُوۡنَ ﴿۱۵۱﴾

“লোকদেরকে বলঃ তোমরা এসো! তোমাদের রাব্ব তোমাদের প্রতি কি কি বিধি-নিষেধ আরোপ করেছেন তা আমি তোমাদেরকে পাঠ করে শোনাই; তা এই যে, তোমরা তাঁর সাথে কেহকেই শরীক করবেনা, মাতা-পিতার সাথে সদ্ব্যবহার করবে, দারিদ্রতার ভয়ে নিজেদের সন্তানদেরকে হত্যা করবেনা। কেননা আমিই তোমাদেরকে ও তাদেরকে জীবিকা দিই; আর অশ্লীল কাজ ও কথার নিকটেও যেওনা, তা প্রকাশ্যই হোক কিংবা গোপনীয়ই হোক, আর আল্লাহ যার হত্যা নিষিদ্ধ করেছেন - যথার্থ কারণ ছাড়া তাকে হত্যা করনা। এসব বিষয় আল্লাহ তোমাদেরকে নির্দেশ দিয়েছেন, যেন তোমরা অনুধাবন করতে পার”

(সূরা আল-আন'আম ১৫১)

وَ لَا تَقۡتُلُوۡۤا اَوۡلَادَكُمۡ خَشۡيَةَ اِمۡلَاقٍ‌ ؕ نَحۡنُ نَرۡزُقُهُمۡ وَ اِيَّاكُمۡ‌ ؕ اِنَّ قَتۡلَهُمۡ كَانَ خِطۡاً كَبِيۡرًا ﴿۳۱﴾

“দরিদ্রতার ভয়ে তোমরা তোমাদের সন্তানদেরকে হত্যা করো না। আমিই তাদেরকে রিযক দেই আর তোমাদেরকেও, তাদের হত্যা মহাপাপ”

(সূরা বনী ইসরাঈল ৩১)

এর ফলে জাহিলি যুগের নারী সংখ্যা হ্রাস পেতে পেতে শেষ পর্যন্ত এমন অবস্থায় পৌঁছেছিল যে, পুরুষের তুলনায় নারী সংখ্যা কমে যায়; ভারসাম্যহীনতার সৃষ্টি হয়।

৩. সম্মানহানি

জাহেলিয়াত যুগের সমাজের অবস্থা ছিল অত্যন্ত শোচনীয়। নারীরা ছিল পণ্য ছাড়া কিছু নয়। কোনো পণ্য বা অর্থের বিনিময়ে নারীদেরকে বন্ধক পর্যন্ত দেয়া হতো।

মুহাম্মদ ইবনে মাসলামা (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বলেন: "আমি যখন কা'বের নিকট গিয়ে শস্যের জন্য আবেদন করলাম, তখন তারা বলল, 'তোমরা তোমাদের স্ত্রীলোকদের আমার

নিকট বন্ধক রাখো।' তারা বললেন, 'আমরা কীভাবে আপনার নিকট আমাদের স্ত্রী লোকদের বন্ধক রাখতে পারি, অথচ আপনি হলেন আরবের সবচেয়ে সুন্দর ও সুশ্রী ব্যক্তি?'" (বুখারী)।

৪. জাহিলি যুগের বিবাহ পদ্ধতি

জাহেলী যুগের বিবাহ পদ্ধতি ও নারীর মর্যাদা জাহেলী যুগের চার ধরনের বিবাহ পদ্ধতি ছিল। এই চার ধরনের বিবাহ পদ্ধতিগুলো হলো:

১. বর্তমান যুগের অনুরূপ প্রকৃতির বিবাহ:

(এটি সাধারণ বিবাহ পদ্ধতি)।

২. ইমতিরা (উচ্চ বংশের জন্য স্ত্রীকে পাঠানো) বিবাহ:

স্বামী বিবাহ করার পর তার স্ত্রীকে বলতো, "ঋতুস্রাব বন্ধ হলে পবিত্র হওয়ার পর তুমি ওই ব্যক্তির নিকট চলে যাবে। তার দ্বারা মজা লুটে নিবে, ওই ব্যক্তির সাথে সঙ্গমে লিপ্ত হবে।" যতদিন পর্যন্ত ওই পুরুষটি দ্বারা তার স্ত্রী গর্ভবতী হওয়ার আলামত না প্রকাশ পেতো, সে তার নিজের স্ত্রীর সাথে সঙ্গমে বিরত থাকতো। অপর পুরুষ দ্বারা গর্ভবতী হলেই সে তার ইচ্ছা অনুযায়ী স্ত্রীর কাছে যেত। জাহেলিয়াতের যুগে লোকদের ধারণা ছিল, এই পদ্ধতির দ্বারা উৎকৃষ্ট ও অভিজাত শ্রেণীর সন্তান জন্ম হয়। এই বিবাহকে ইমতিরা বলে। আর এই পদ্ধতির মাধ্যমে সাধারণত নিম্ন বা মধ্য শ্রেণীর লোকেরা তাদের স্ত্রীকে উচ্চ মর্যাদার সমাজের অভিজাত শ্রেণীর লোকেদের কাছে এবং যাদের কিনা বংশীয়ভাবে মর্যাদা উচ্চ ছিল, তাদের কাছে পাঠাতো।

৩. সম্মিলিত সঙ্গম বিবাহ:

তৃতীয় প্রকারের বিবাহ ছিল, একজন নারীকে কয়েকজন পুরুষ মিলে ভোগ করতো, কিন্তু এর সংখ্যা ১০ এর অধিক ছিল না। স্ত্রী লোকটি যখন গর্ভবতী হয়ে সন্তান প্রসব করত, এর পরবর্তীতে সে সমাজের সকল লোকদেরকে একত্রিত করত। এবং যাদের সাথে সে এতদিন সঙ্গমে লিপ্ত ছিল, তাদের সকলকেই ডাকত। এখানে সঙ্গমকৃত ব্যক্তিরা অস্বীকার করতে পারত না, ফলে তারা সকলে উপস্থিত হত। উপস্থিত হওয়ার পরে স্ত্রী লোকটি বলতো, "তোমরা সকলে আমার সাথে সঙ্গম করতে আসতে, আর এখন আমার সন্তান ভূমিষ্ঠ হয়েছে।" অতঃপর স্ত্রী লোকটি ওই দশজন ব্যক্তির মধ্যে থেকে যে কোনো একজনের দিকে নির্দেশ করে বলতো, "এটি তোমার সন্তান, তোমার পছন্দমত এর নাম রাখ।" এইভাবে করে স্ত্রী লোকটি যার নাম উচ্চারণ করত, সেই ওই নবজাতকের পিতা হত। এই ক্ষেত্রে ওই পুরুষ লোকটির এখানে দায়ভার এড়ানোর বা অস্বীকার করার কোনো অবকাশ থাকতো না, তাকেও মেনে নিতে হতো নবজাতক শিশুটি তারই সন্তান।

৪. পতাকাধারী পেশাদার পতিতার বিবাহ:

চার নম্বর বিবাহ পদ্ধতি: কোনো কোনো নারীর ঘরে পতাকা বা সাংকেতিক চিহ্ন স্বরূপ কোনো নির্দেশিকা থাকতো। এই মহিলারা ছিল পেশাদার বাজারি পতিতা। সমাজের সকল শ্রেণী, সকল পেশা এবং সকল মানুষেরই তাদের সাথে সঙ্গম করার অনুমতি ছিল। ফলে ওই বাজারি মহিলা যখন কিনা গর্ভধারণ করে সন্তান ভূমিষ্ঠ করত, তখন তার সাথে যৌনাচারে লিপ্ত সকল পুরুষগণ একত্রিত হত। এ সময় একজন গণককে আহবান করা হতো এবং ওই গণক এসে নির্ধারণ করত নবজাতকের পিতার নাম। গণক যাকে ওই সন্তানের পিতা বলে আখ্যায়িত করত, তাকেই এই সন্তানের সমস্ত দায়-দায়িত্ব বহন করতে হতো। এই সন্তান গণকের নির্ধারিত পিতার পরিচয়ে সমাজে পরিচিত হতো।

জাহেলী যুগের জঘন্য মানসিকতা:

জাহেলী যুগের তিন প্রকার বিবাহ পদ্ধতি ছিল অত্যন্ত জঘন্য। তাদের মন-মানসিকতা এত নিম্ন পর্যায়ে পতিত হয়েছে যে, এখানে একজন স্বামীর আত্মমর্যাদাবোধ বলতে কিছু ছিল না।

একজন স্বামী কীভাবে পারে তার নিজের স্ত্রীকে অন্যের সাথে যৌনাচারে লিপ্ত করতে? সামাজিকতা এবং মন-মানসিকতার অবক্ষয় যেন সমাজের দ্বারে দ্বারে পৌঁছে গিয়েছিল। যিনা-ব্যভিচার—এগুলো সবকিছুকেই তারা হালাল বানিয়ে ফেলেছিল। এই জঘন্যতম পাপাচারকে তারা পাপাচার হিসাবে গণ্য করার ক্ষমতা হারিয়ে ফেলেছিল। এ থেকে বোঝা যায় যে, জাহেলী যুগে নারী সমাজ তাদের ইজ্জত-সম্মান ও স্বাভাবিক মূল্যবোধ থেকে বঞ্চিত হয়েছিল।

৫. দাসীদেরকে পতিতাবৃত্তিতে বাধ্য করা

দাসীদেরকে পতিতাবৃত্তিতে বাধ্য করা হতো। সেই অর্থ যাতে মনিব পায় সেজন্য দাসীকে এ কাজে জোর করা হতো।

এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন:

وَ لۡيَسۡتَعۡفِفِ الَّذِيۡنَ لَا يَجِدُوۡنَ نِكَاحًا حَتّٰى يُغۡنِيَهُمُ اللّٰهُ مِنۡ فَضۡلِهٖ ؕ وَ الَّذِيۡنَ يَبۡتَغُوۡنَ الۡكِتٰبَ مِمَّا مَلَكَتۡ اَيۡمَانُكُمۡ فَكَاتِبُوۡهُمۡ اِنۡ عَلِمۡتُمۡ فِيۡهِمۡ خَيۡرًا ۖ وَّ اٰتُوۡهُمۡ مِّنۡ مَّالِ اللّٰهِ الَّذِىۡۤ اٰتٰىكُمۡ ؕ وَ لَا تُكۡرِهُوۡا فَتَيٰتِكُمۡ عَلَى الۡبِغَآءِ اِنۡ اَرَدۡنَ تَحَصُّنًا لِّتَبۡتَغُوۡا عَرَضَ الۡحَيٰوةِ الدُّنۡيَا ؕ وَ مَنۡ يُّكۡرِهۡهُّنَّ فَاِنَّ اللّٰهَ مِنۡۢ بَعۡدِ اِكۡرَاهِهِنَّ غَفُوۡرٌ رَّحِيۡمٌ ﴿۳۳﴾

"যাদের বিয়ের সামর্থ্য নেই আল্লাহ তাদেরকে নিজ অনুগ্রহে অভাবমুক্ত না করা পর্যন্ত তারা যেন সংযম অবলম্বন করে এবং তোমাদের মালিকানাধীন দাসদাসীদের মধ্যে কেহ তার মুক্তির জন্য লিখিত চুক্তি করতে চাইলে তাদের সাথে চুক্তিতে আবদ্ধ হও, যদি তোমরা তাদের মধ্যে মঙ্গলের সন্ধান পাও; আল্লাহ তোমাদের যে সম্পদ দিয়েছেন তা হতে তোমরা তাদেরকে দান করবে। তোমাদের দাসীরা সততা রক্ষা করতে চাইলে পার্থিব জীবনের ধন সম্পদের লালসায় তাদেরকে ব্যভিচারিণী হতে বাধ্য করনা, আর যে

তাদেরকে বাধ্য করে, সেরূপ ক্ষেত্রে তাদের উপর যবরদস্তির পর আল্লাহ ক্ষমাশীল, দয়ালু”

(সূরা নূর আয়াত-৩৩)

ইসলামের পূর্বে জাহেলী যুগের লোকেরা শুধু কিছু টাকার লোভে নিজেদের দাসীদেরকে ব্যভিচারের মত জঘন্য কাজে লিপ্ত হতে বাধ্য করত। সুতরাং ইচ্ছা-অনিচ্ছায় তাদেরকে কলংকের ছাপ গায়ে এঁকে নিতে হত। মহান আল্লাহ মুসলিমদেরকে এ রকম করতে নিষেধ করলেন। ‘সতীত্ব রক্ষা করতে চাইলে’-- এ কথা স্বাভাবিক পরিস্থিতির দিকে খেয়াল করে বলা হয়েছে। নচেৎ এর অর্থ এই নয় যে, ‘তারা সতীত্ব রক্ষা করতে না চাইলে’ বা ‘তারা ব্যভিচার পছন্দ করলে’ তাদের দ্বারা উক্ত কাজ করিয়ে নাও। বরং এই নির্দেশের উদ্দেশ্য এই যে, সামান্য পার্থিব ধন-লালসায় দাসীদের দ্বারা এ কাজ করায়ো না। কারণ, এ রকম উপার্জন হারাম। যেমন হাদীসে বর্ণিত হয়েছে।

অর্থাৎ, যে সব দাসী দ্বারা বাধ্যতামূলকভাবে এ রকম অশ্লীল কাজ করানো হয়, সে সব দাসীর পাপ হবে না। কারণ তারা অসহায়। বরং পাপী হবে তাদেরকে বাধ্যকারী মালিকরা। হাদীসে এসেছে ‘আমার উম্মতের ভুল-ত্রুটি আর এমন কাজ যা করতে বাধ্য করা হয়, তা ক্ষমার যোগ্য।’ (ইবনে মাজাহঃ তালাক অধ্যায়)

৬. পশুর মাংসে ও দুধে নারীর অনধিকার

নারীরা পশুর দুধ খেতে পারতো না। পশু যেই বাচ্চা জন্ম দিতো সেটা জবাই করলেও খেতে পারতো না, শুধু পুরুষরা খেতো।

এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা’আলা ইরশাদ করেন:

আর তারা বলে, ‘এই চতুষ্পদ জন্তুগুলোর পেটে যা আছে, তা আমাদের পুরুষদের জন্য নির্দিষ্ট এবং আমাদের স্ত্রীদের জন্য হারাম। আর যদি তা মৃত হয়, তবে তারা সবাই

তাতে শরীক’। অচিরেই তিনি তাদেরকে তাদের কথার প্রতিদান দেবেন। নিশ্চয় তিনি প্রজ্ঞাবান, জ্ঞানী।

এই আয়াতের তাফসীর ইবনে কাসীর থেকে প্রাসঙ্গিক অংশটুকু:

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, কাফিররা

যে বলতো, এই পশুগুলোর গর্ভে যা কিছু রয়েছে তা আমাদের পুরুষদের জন্যে নির্দিষ্ট।’ এর দ্বারা পশুর দুধ উদ্দেশ্য। তারা কোন কোন পশুর দুধ স্ত্রী লোকদের উপর হারাম করে দিতো এবং পুরুষেরা পান করতো। যদি বকরীর নর বাচ্চা পয়দা হতো তবে তা যবাই করে শুধু পুরুষ লোকেরাই খেতো, নারীদেরকে দিতো না। তাদেরকে বলতোঃ “তোমাদের জন্যে এটা হারাম।” মাদী বাচ্চা হলে ওটাকে যবাই করতো না, বরং পালন করতো। আর যদি মৃত বাচ্চা পয়দা হতো তবে পুরুষ নারী সবাই মিলিতভাবে খেতো। আল্লাহ এরূপ করতে নিষেধ করলেন।

শাবী (রঃ) বলেন যে, বাহীরা পশুর দুধ শুধুমাত্র পুরুষেরাই খেতো। কোন পশু মরে গেলে পুরুষদের সাথে নারীদেরকেও অংশ দেয়া হতো।

কন্যা হিসেবে ইসলামে নারীর অধিকার

রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, কন্যা সন্তান বরকত ও কল্যাণের প্রতীক। ইসলামে পুত্রসন্তান ও কন্যা সন্তানের মধ্যে মর্যাদাগত কোনো পার্থক্য নেই। ইসলামে কন্যা সন্তানকে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করতে নিষেধ করা হয়েছে। রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, "যে ব্যক্তি তার কন্যা সন্তানের কারণে কোনো রূপ পরীক্ষার সম্মুখীন হয়, সে তার ব্যাপারে ধৈর্য ধারণ করলে তার জন্য জাহান্নাম থেকে আবরণ হবে।" (হাদিস)০

কন্যা সন্তানদের লালন-পালনের সওয়াব ও ফজিলত যেমন আছে, তেমনি আছে তার অধিকার ও হকসমূহের বর্ণনা। সন্তানদের প্রতি সমতা বজায় রাখা (অপরিহার্য)। কারো কাছে পুত্র সন্তান বেশি প্রিয়, কারো কাছে কন্যা সন্তান বেশি প্রিয়। কিন্তু এ বিষয়ে সমতা বজায় রাখা অপরিহার্য। সন্তানদের প্রতি সমতা না থাকলে এর জন্য কিয়ামত দিবসে আল্লাহ (সুবহানাহু ওয়া তা'আলার) কাছে জবাবদিহি দিতে হবে।

একবার একজন আনসারী সাহাবীকে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ডাকলেন। ইতিমধ্যে ওই সাহাবীর এক পুত্র তার কাছে এলো। তিনি তাকে চুমু খেয়ে বুকে জড়িয়ে নিলেন এবং কোলে বসালেন। কিছুক্ষণ পর তার কন্যাও সেখানে উপস্থিত হলো। তিনি তার হাত ধরে নিজের কাছে বসালেন। এটি লক্ষ্য করে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইরশাদ করলেন, "উভয় সন্তানের প্রতি তোমার আচরণ অভিন্ন হওয়া উচিত ছিল না? তোমরা নিজেদের সন্তানের মাঝে সমতা রক্ষা করো, এমনকি চুমু খাওয়ার ক্ষেত্রেও।" (মুসান্নাফ আব্দুর রাজ্জাক, ৯০০)।

সন্তানদের প্রতি আদর স্নেহ প্রকাশের মনোভাব এবং হাদিয়া ও উপহার দেয়ার ক্ষেত্রেও সমতা বজায় রাখা জরুরী, ইসলাম কখনো পক্ষপাতিত্ব পছন্দ করেন না, সন্তানের অধিকারের ক্ষেত্রেও ইসলাম সর্বদাই ন্যায় বিচার করে, ঠিক এমনই ভাবে একজন পুত্র

সন্তানকে লালন করার ক্ষেত্রে যে পরিমাণ অর্থ ব্যয় করা হয় এবং তাকে যে পরিমাণ খাবার দাবার কাপড়-চোপড় আনুষঙ্গিক জিনিসগুলোর প্রতি যত্নশীল হয় ঠিক একটা কন্যা সন্তানের ক্ষেত্রেও সেই পরিমাণ অর্থ ব্যয় করতে হবে এবং তাকেও খাবার দাবার সমপরিমাণ দিতে হবে, এখানে ভেদাভেদ করা বা কারো পক্ষপাতিত্ব করার কোন অবকাশ নেই। একজন সন্তানকে যেমন হাদিয়া উপহার বা তার সফলতার প্রতি খুশি হয়ে যেই পরিমাণ হাদিয়া দেয়া হয় ঠিক সেই পরিমাণ অপর আরেকজন সন্তানের ক্ষেত্রেও দিতে হবে, ঈদের সালামের ব্যাপার এখানে আসতে পারে ইদি, দেয়ার ক্ষেত্রেও এখানে সমতা বজায় রাখতে হবে।

হাদিস শরীফে এসেছে বশির ইবনে সাদ রাদিয়াল্লাহু আনহু একবার নিজ পুত্র নোমান ইবনে বশির কে কিছু জিনিস হাদিয়া করলেন এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সাক্ষী বানানোর জন্য নোমানকে তার নিকট নিয়ে এলেন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞাসা করলেন তুমি কি তোমার সকল সন্তানকে এরূপ উপহার দিয়েছো তিনি বললেন জি না নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করলেন আল্লাহকে ভয় কর এবং সন্তানদের মাঝে সমতা রক্ষা করো আর এতটুকু চেষ্টা অবশ্যই কর যে উপহার সদাচার ইত্যাদির ক্ষেত্রে প্রত্যেকের অংশ যেন কাছাকাছি হয় (মুসলিম হাদিস)

এখান থেকে বোঝা যায় যে রাসূল সাল্লাল্লাহু সাল্লাম কখনোই একজন কন্যা সন্তান এবং একজন পুত্র সন্তান এর ভিতরে কোন প্রকার পক্ষপাতিত্ব করেন নাই সন্তান বলতে এখানে কন্যা সন্তান পুত্র সন্তান উভয়কেই বোঝানো হয়েছে কন্যা সন্তানকে আল্লাহ তা'আলা রহমত হিসেবে প্রেরণ করেন আল্লাহ তা'আলা যখন তার বান্দার প্রতি খুশি হন তখন তাকে কন্যা সন্তান দান করেন রাসূল সাল্লাল্লাহু সাল্লাম নিজেও কন্যা সন্তানকে অনেক পছন্দ করতেন তিনি কন্যাদের সম্পর্কে অনেক হাদিস বলেছেন যার ঘরে কিনা কন্যা সন্তান জন্ম নিল সে জান্নাত পেল একজন নারী যখন কন্যা সন্তান তখন তার লালন পালনের সম্পূর্ণ দায়ভার থাকে তার পিতার ওপরে তার বিয়ের পূর্ব পর্যন্ত এই দায়-দায়িত্ব তার পিতাকেই বহন করতে হয় এ থেকে বোঝা যায় যে একজন নারী যখন কন্যা অবস্থায় থাকে তখন তার নিজের ওপরে আর্থিক কোন দায়িত্ব থাকে না, সম্পূর্ণ দায়িত্ব তার পিতাই বহন করে, ইসলামে এর পরিপূর্ণ বিধান রয়েছে।

কন্যা সন্তানের মাধ্যমে আল্লাহ পরিবারে সুখ ও বরকত দান করেন। হাদিসে এমন কথা উল্লেখ হয়েছে।

হজরত আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত হাদিসে নবী (সা.) বলেন,

“যে ব্যক্তি দু’টি কন্যাকে তারা সাবালিকা হওয়া পর্যন্ত লালন-পালন করবে, কেয়ামতের দিন আমি এবং সে এ দু’টি আঙ্গুলের মতো পাশাপাশি আসবো (অতঃপর তিনি তার আঙ্গুলগুলি মিলিত করে দেখালেন)”

(মুসলিম, হাদিস নং: ২৬৩১, তিরমিজি, হাদিস নং: ১৯১৪, মুসনাদ আহমদ, হাদিস নং: ১২০৮৯, ইবনু আবি শাইবা, হাদিস নং: ২৫৯৪৮)

কোরআনে কন্যা সন্তানকে আল্লাহ প্রদত্ত 'শ্রেষ্ঠ উপহার' ও 'নেয়ামত' হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। ইসলামে কন্যা সন্তানকে অশুভ মনে করা কাফেরদের বদভ্যাস এবং কন্যাসন্তানের আগমনকে 'সুসংবাদ' বলা হয়েছে।

- শ্রেষ্ঠ উপহার ও নেয়ামত: কন্যা সন্তানকে আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে একটি বিশেষ নেয়ামত বা শ্রেষ্ঠ উপহার হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছে।
- সুসংবাদ: কোরআনে কন্যাসন্তানের সংবাদকে 'সুসংবাদ' বলা হয়েছে।
- অশুভ মনে করা: কন্যা সন্তানকে অশুভ মনে করাকে কাফেরদের বদভ্যাস হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে এবং একে খাঁটি মুমিনদের বৈশিষ্ট্য নয় বলে উল্লেখ করা হয়েছে।
- জান্নাতের দাওয়াতনামা: কিছু ব্যাখ্যায় বলা হয়, কন্যা সন্তান মা-বাবার জন্য জান্নাতের দাওয়াতনামা নিয়ে দুনিয়ায় আসে।

পবিত্র কোরআনে মহান আল্লাহ ইরশাদ করেন, ‘তাদের কাউকে যখন কন্যা সন্তানের সুসংবাদ দেওয়া হয়, তখন তার মুখমণ্ডল কালো হয়ে যায় এবং সে অসহনীয় মনোস্তাপে ক্লিষ্ট হয়।

তাকে যে সুসংবাদ দেওয়া হয়, তার গ্লানি হেতু সে নিজ সম্প্রদায় হতে আত্মগোপন করে; সে চিন্তা করে যে হীনতা সত্ত্বেও সে তাকে রেখে দেবে, না মাটিতে পুঁতে দেবে। লক্ষ করো, সে কত নিকৃষ্ট সিদ্ধান্ত স্থির করেছিল। (সুরা : নাহল, আয়াত : ৫৮-৫৯)

রাসুলুল্লাহ (সা.) কন্যা সন্তান লালন-পালনকারীর জন্য তিনটি পুরস্কারের ঘোষণা দিয়েছেন—এক. জাহান্নাম থেকে মুক্তি, দুই. জান্নাতে প্রবেশের নিশ্চয়তা এবং তিন. জান্নাতে রাসুল (সা.)-এর সঙ্গী হওয়ার সৌভাগ্য।

রাসুল (সা.) মেয়েদের অনেক বেশি ভালোবাসতেন। মেয়েরা ছিল তার আদরের দুলালী। আজীবন তিনি কন্যাদের ভালোবেসেছেন এবং কন্যা সন্তান প্রতিপালনে অন্যদের উদ্বুদ্ধ করেছেন। কন্যা সন্তান লালন-পালনে অনেক উৎসাহ দিয়েছেন।

যে বাবা-মা কন্যাকে ভালোবাসা ও সঠিক শিক্ষা দিয়ে বড় করে, আল্লাহ তার প্রতি বিশেষ রহমত বর্ষণ করেন। হাদিস থেকে আমরা বুঝতে পারি যে, কন্যা সন্তানকে যত্ন সহকারে লালন-পালন করা আল্লাহর কাছে অত্যন্ত পছন্দনীয় কাজ। কন্যা সন্তান আল্লাহর অমূল্য বরকত।

ইসলামে স্ত্রীর অধিকার ও অবস্থান

মানুষের জীবনে সবচেয়ে অন্তরঙ্গ সঙ্গী হলো তার স্ত্রী। সুখে-দুঃখে, বিপদে- আপদে, ঘরে-সফরে বিবাহ থেকে মৃত্যু পর্যন্ত একজন স্ত্রী সর্বদা নিজেকে স্বামীর সেবায় নিয়োজিত রাখেন। এজন্য আল্লাহ তা'আলা স্বামী-স্ত্রী পরস্পরকে পরস্পরের পোশাকের সাথে উপমা দিয়েছেন। তিনি বলেন,

هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ.

অর্থ: স্ত্রীগণ তোমাদের পোশাকস্বরূপ আর তোমরা স্ত্রীদের পোশাকস্বরূপ। (সূরা বাকারা-১৮৭)

অর্থাৎ পোশাক যেমন শরীরের সাথে লেগে থাকে তেমনি স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্কও অবিচ্ছেদ্য এবং সর্বদা লেগে থাকার।

আল্লাহ তা'আলা স্ত্রীদেরকে সৃষ্টি করেছেন স্বামীদের প্রেমাষ্পদ হিসেবে, স্বামীদের শান্তি অর্জনের জন্য। ইরশাদ হচ্ছে,

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً

অর্থ : আল্লাহ তা'আলার নিদর্শনাবলীর মধ্যে একটি হল; তিনি তোমাদের জন্য তোমাদের থেকে স্ত্রীগণকে সৃষ্টি করেছেন। যাতে তোমরা তাদের কাছে শান্তি পাও। আর তিনি তোমাদের মাঝে ভালোবাসা ও অন্তরঙ্গতা সৃষ্টি করেছেন। (সূরা রূম-২১)

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন,

لم ير للمتحابين مثل النكاح.

অর্থ: বিবাহের মাধ্যমে স্বামী-স্ত্রীর মাঝে যে ভালোবাসা সৃষ্টি হয় তার অনুরূপ আর কোথাও পরিলক্ষিত হয় না। (সুনানে ইবনে মাজাহ; হা.নং ১৮৪৭)

তিনি আরো বলেন, মুমিন ব্যক্তি তাকওয়া অর্জনের পর উত্তম বিবি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ কোন জিনিস অর্জন করতে পারে না। (প্রাগুক্ত; হা.নং ১৮৫৭)

স্ত্রী হল স্বামীর অর্ধেক দীন-ধর্ম সংরক্ষণকারী। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, যখন কোন বান্দা বিবাহ করে তখন সে তার অর্ধেক দীনদারী পূর্ণ করে নিল। অতএব সে যেন বাকিটুকুর ব্যাপারে আল্লাহকে ভয় করে। (শু'আবুল ঈমান; হা.নং ৫১০০)

১. ভরণ-পোষণের দায়িত্ব

ইসলাম স্বামীকে হালাল অর্থ দ্বারা সাধ্যানুযায়ী স্ত্রীর ভরণ-পোষণের দায়িত্ব দিয়েছে। শরীয়তের

কোথাও স্ত্রীকে চাকুরী করা বা অর্থ উপার্জনের দায়িত্ব দেয়া হয়নি। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ.

অর্থ : স্বামীর জন্য আবশ্যক হল, ন্যায়সঙ্গতভাবে স্ত্রীদের ভরণ-পোষণের ব্যবস্থা করা। (সূরা বাকারা-২৩৩)

তাছাড়া কেউ কারো সেবায় নিয়োজিত থাকলে তার সর্ববিধ খরচাদি সেবা গ্রহণকারীর উপরই ন্যস্ত থাকে। সুতরাং স্ত্রীর বেলায়ও এ নীতি প্রযোজ্য হবে। আরাফার ময়দানে বিদায়ী ভাষণে এবং জীবনের অন্তিম সময় যখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যবান আড়ষ্ট হয়ে পড়েছিল, আওয়াজ ক্ষীণ হয়ে এসেছিল তখনো তিনি বলেছিলেন,

الله الله في النساء فإنهن عوان في أيديكم.

অর্থ: স্ত্রীদের ব্যাপারে তোমরা আল্লাহকে ভয় কর। কারণ, তারা তোমাদের হাতে আবদ্ধ। (মুসনাদে আহমাদ; হা.নং ২০৬৯৫)

সাহাবী হযরত মু'আবিয়া ইবনে হায়দা রাযি. রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমাদের প্রতি

আমাদের স্ত্রীদের কী কী অধিকার রয়েছে? রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, যখন তোমরা খাবে তাদেরকেও খাওয়াবে, যখন তোমরা পরিধান করবে তাদেরকেও পরতে দিবে। (সুনানে আবু দাউদ; হা.নং ২১৪২)

এমনকি সর্বোত্তম সওয়াবের কাজ পরিবারে ব্যয় করা

وَعَنْ أَبِي هُرَيرَةَ رضي الله عنه، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم: «دِينَارٌ أَنْفَقْتَهُ في سَبيلِ اللهِ، وَدِينار أَنْفَقْتَهُ في رَقَبَةٍ، وَدِينارٌ تَصَدَّقْتَ بِهِ عَلَى مِسْكِينٍ، وَدِينَارٌ أَنْفَقْتَهُ عَلَى أَهْلِكَ، أَعْظَمُهَا أَجْراً الَّذِي أَنْفَقْتَهُ عَلَى أَهْلِكَ». رواه مسلم

আবূ হুরাইরাহ রাদিয়াল্লাহু 'আনহু বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, ''এক দ্বীনার (স্বর্ণমুদ্রা) তুমি আল্লাহর পথে ব্যয় কর, এক দ্বীনার ক্রীতদাস মুক্ত করার কাজে ব্যয় কর, এক দ্বীনার কোন মিসকীনকে সদকাহ কর এবং এক দ্বীনার তুমি পরিবার পরিজনের জন্য ব্যয় কর। এ সবের মধ্যে ঐ দ্বীনারের বেশী নেকী রয়েছে যেটি তুমি পরিবার-পরিজনের উপর ব্যয় করবে।'' (মুসলিম ৯৯৫)

২. বসবাসের ব্যবস্থা:

বসবাসের জন্য স্ত্রীকে প্রয়োজন অনুযায়ী পৃথক ঘর অথবা পৃথক কামরা দেয়া জরুরী, যেখানে সে স্বাধীনভাবে স্বামীর সাথে সময় যাপন করতে পারে এবং নিজের মালামাল হেফাযত করতে পারে। স্ত্রী যদি স্বামীর পিতা-মাতা ও আত্মীয়দের সাথে একত্রে থাকতে না চায় তাহলে তাকে পৃথক রাখা স্বামীর কর্তব্য। আর চুলার আগুন পৃথক করা তার চেয়ে অধিক গুরুত্বপূর্ণ। শরীয়তের দৃষ্টিতে শ্বশুর-শাশুড়ীর খিদমত করা স্ত্রীর উপর ওয়াজিব নয়। তবে পুত্রবধূগণ স্বেচ্ছায় তা করলে বহুগুণ সওয়াবের অধিকারী হবে। মূলত স্বামীর মাতা-পিতার খিদমত করা স্বামীর দায়িত্ব। সে নিজে করবে অথবা অন্য লোক দিয়ে করাবে। বর্তমান সমাজে অনেক স্বামী জোরপূর্বক স্ত্রীকে মাতা-পিতার শাসনাধীন রাখে। তাদের সেবা করতে বাধ্য করে। ভাই-বোন ও আত্মীয়-স্বজনের সাথে একান্নভুক্ত থাকা সওয়াবের কাজ ও গৌরব জ্ঞান করে, যা স্ত্রীর প্রতি অন্যায় ও জুলুম। শরীয়তের দৃষ্টিতে মাতা-পিতার করণীয় হল, পুত্র ও পুত্রবধূকে স্বাধীনভাবে থাকতে দেয়া। স্বেচ্ছায় তারা যতটুকু সেবা করে ততটুকুতে খুশি থাকা এবং সে জন্যে তাদের কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করা।

৩. স্ত্রীর সাথে রাত্রিযাপন:

প্রয়োজন অনুযায়ী স্ত্রীর জৈবিক ও দৈহিক চাহিদা পূরণ করা স্বামীর দায়িত্ব। প্রতি চার মাসে অন্ততস্ত্রীর সাথে রাত্রিযাপন:

প্রয়োজন অনুযায়ী স্ত্রীর জৈবিক ও দৈহিক চাহিদা পূরণ করা স্বামীর দায়িত্ব। প্রতি চার মাসে অন্তত একবার স্ত্রীর সাথে দৈহিক মেলামেশা করা স্বামীর

জন্য আবশ্যক। স্বামী যদি তার হক আদায় না করে আর স্ত্রী কোন গুনাহে জড়িয়ে পড়ে তবে তার জন্য দায়ী হবে স্বামী এবং এর জন্য পরকালে তাকে শাস্তি ভোগ করতে হবে।

আল্লাহ তা'আলা স্বামীদেরকে উদ্দেশ্য করে ইরশাদ করেন,

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ

অর্থ : বিবিদেরকে বসবাস করাও যেখানে তোমরা বসবাস কর। (সূরা তালাক-৬)

অন্য আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলেন, তোমরা স্ত্রীদের পোশাক স্বরূপ আর স্ত্রীরা তোমাদের পোশাক স্বরূপ। আজ স্বামী কর্তৃক সেই পোশাক খুলে ফেলার কারণে, তার হক আদায় না করার কারণে স্ত্রীরা অন্যায়ে জড়িয়ে পড়েছে। এ কারণে শরীয়তের দৃষ্টিতে স্ত্রী অপরাধী হলেও মূল অন্যায়টা স্বামীর। কেননা স্বামীর শরয়ী বিধান লঙ্ঘনের দরুণই স্ত্রীর পক্ষ হতে সীমালঙ্ঘনের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে।

৪. স্ত্রীর সাথে সদ্ব্যবহার:

স্ত্রীর ভুল-ত্রুটি ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে দেখা। তার সাথে নম্র আচরণ করা এবং তাকে খুশি রাখা স্বামীর কর্তব্য। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন,

وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ.

অর্থ: তোমরা স্ত্রীদের সাথে সদাচরণ কর। (সূরা নিসা-১৯)

হযরত আবু হুরাইরা রাযি. থেকে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন,

أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا وخياركم خياركم لنسائهم.

অর্থ: মুমিনদের মধ্যে পূর্ণাঙ্গ ঈমানদার সেই ব্যক্তি যার চরিত্র উত্তম। আর তোমাদের মধ্যে সেই উত্তম যে তার পরিবারের কাছে উত্তম। (সুনানে তিরমিযী; হা.নং ১১৬২)

এ ধরনের আরো বহু বর্ণনা হাদীসগ্রন্থে রয়েছে যেখানে স্ত্রীর কাছে ভালো হওয়া পুরুষের জন্য প্রকৃতার্থে ভালো হওয়ার মানদণ্ড নির্ণয় করা হয়েছে।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদেরকে প্রহার করতে নিষেধ করে বলেন,

لا تضربوا إماء الله

অর্থ : তোমরা আল্লাহর বান্দীদেরকে প্রহার করো না। (সুনানে আবু দাউদ; হা.নং ২১৪৬)

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোন দিন কোন বিবি কিংবা চাকর-নওকরকে প্রহার করেননি। আর যারা স্ত্রীর গায়ে হাত তোলে তাদেরকে অভদ্র বলেছেন।

৫. মহর আদায় করা

মহর মূলত একটি সম্মানী যা দ্বারা স্ত্রীকে সম্মান প্রদর্শন করা হয়। শরীয়তের দৃষ্টিতে স্বামীর সামর্থ্যানুযায়ী মহর নির্ধারণ করা সবচেয়ে উত্তম। যতটুকু মহর নির্ধারণ করা হবে তা পরিপূর্ণ আদায় করা জরুরী। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন,

وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً

অর্থ : স্ত্রীদেরকে তাদের মহর যথাযথভাবে আদায় করে দাও। (সূরা নিসা-৪)

স্ত্রীর লাজুকতা বা অসহায়ত্বের সুযোগ নিয়ে কিংবা চাপ প্রয়োগ করে কখনোই স্ত্রীকে মহরের অধিকার থেকে বঞ্চিত করা জায়েয নয়।

আর প্রিয় নবী (ﷺ) বলেন,

إِنَّ أَحَقَّ الشَّرْطِ أَنْ يُوفَى بِهِ مَا اسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ الْفُرُوجَ.

“ সবচেয়ে অধিক গুরুত্বপূর্ণ শর্ত যা পূরণ করা জরুরী, তা হল সেই বস্তুত যার দ্বারা তোমরা (স্ত্রীদের) গুপ্তাঙ্গ হালাল করে থাক।’’

সুতরাং স্ত্রীকে তার ঐ প্রদেয় মোহর প্রদান করা ফরয। জমি, জায়গা, অর্থ, অলঙ্কার, কাপড়-চোপড় ইত্যাদি মোহরে দেওয়া চলে। বরং প্রয়োজনে (পাত্রীপক্ষ রাজী হলে) কুরআন শিক্ষাদান, ইসলাম গ্রহণও মোহর হতে পারে।

স্ত্রীকে মোহর না দিয়ে বিবাহ করলে অনেকের নিকট বিবাহ বাতিল। হজরত মূসা (আঃ) তাঁর প্রদেয় মোহরের বিনিময়ে শ্বশুরের আট অথবা দশ বছর মজুরী করেছিলেন। মোহরের অর্থ কেবলমাত্র স্ত্রীর প্রাপ্য হক; অভিভাবকের নয়। এতে বিবাহের পরে স্বামীরও কোন অধিকার নেই। স্ত্রী বৈধভাবে যেখানে ইচ্ছা সেখানে খরচ করতে পারে। অবশ্য স্ত্রী সন্তুষ্টচিত্তে সেবচ্ছায় স্বামীকে দিলে তা উভয়ের জন্য বৈধ

৬. স্ত্রীকে ধর্মীয় শিক্ষা প্রদান

স্বামীর কাছে স্ত্রীর যেমন জৈবিক অধিকার রয়েছে তেমনি ধর্মীয় অধিকারও রয়েছে। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন,

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا

অর্থ: হে মুমিনগণ! তোমরা নিজেদেরকে এবং পরিবারকে জাহান্নাম থেকে রক্ষা কর। (সূরা তাহরীম-৬)

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন,

الرجل راع على أهل بيته وهو مسؤول عن رعيته.

অর্থ: পুরুষ তার পরিবারের যিম্মাদার, তাকে তার পরিবারের সম্পর্কে জবাবদিহি করতে হবে। (সহীহ বুখারী; হা.নং

প্রত্যেক পুরুষের কর্তব্য হল, দীনদার নারী বিবাহ করা। তাহলে স্ত্রী স্বেচ্ছায় দীনের উপর চলবে। আর যদি অশিক্ষিত বা জেনারেল শিক্ষিত নারী বিবাহ করা হয় তাহলে তাকে নামায-রোযা, মাসআলা-মাসাইল, ইবাদত-বন্দেগীর হায়েয-নিফাস প্রভৃতির বিধান, বিদ'আত ও রুসূমাত পরিহার করা ইত্যাদি বিষয়ক ইলম শিক্ষা দেয়া স্বামীর জন্য ফরজ

৭. স্ত্রীর চারিত্রিক বিষয়

অনেকে স্ত্রীর চারিত্রিক বিষয়ে অহেতুক সন্দেহ করে, তার প্রতি মন্দ ধারণা রাখে। এটা গুনাহের কাজ। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ.

অর্থ: কিছু কিছু ধারণা সরাসরি গুনাহ। (সূরা হুজুরাত-১২)

এক্ষেত্রে স্বামীর করণীয় হল, বিবাহের পূর্বে সর্ববিষয়ে সাধ্যানুযায়ী যাচাই- বাছাই করা। বিবাহের পরে স্পষ্ট দলীল ব্যতীত স্ত্রীর প্রতি কোন মন্দ ধারণা না করা। বরং নিজের জীবনের অন্যায়ের দিকে দৃষ্টিপাত করা। আর এই বিশ্বাস রাখা যে, যে বিবি আমার জন্য উপযুক্ত ও কল্যাণকর আল্লাহ তা'আলা আমার জন্য তাকেই বরাদ্দ করেছেন। অতএব আমি তাকে নিয়েই সন্তুষ্ট থাকবো। কারণ সূরা নূরে এসেছে,

الْخَبِيثَاتُ لِلْخَبِيثِينَ وَالْخَبِيثُونَ لِلْخَبِيثَاتِ وَالطَّيِّبَاتُ لِلطَّيِّبِينَ وَالطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبَاتِ

অর্থ: মন্দ নারীগণ মন্দ পুরুষদের জন্য আর মন্দ পুরুষগণ মন্দ নারীদের জন্য, উত্তম নারীগণ উত্তম পুরুষদের জন্য আর উত্তম পুরুষগণ উত্তম নারীদের জন্য। (সূরা নূর-২৬)

অতএব আশা করা যায়, আমি যদি সৎচরিত্রের অধিকারী হই তবে আমার স্ত্রীও চরিত্রবতী হবে। অনেকে স্ত্রীর সাথে দৈহিক মিলনের গোপনীয় বিষয় বন্ধু- বান্ধবদের

কাছে প্রকাশ করে দেয়, এটা মারাত্মক গুনাহের কাজ এবং স্ত্রীর অধিকার ক্ষুণ্ন করার শামিল। এমন গর্হিত কাজ থেকে বিরত থাকা অত্যন্ত জরুরী।

৮. স্ত্রীর মান-অভিমান

ইসলাম স্বামীর সাথে স্ত্রীর মান-অভিমানের অধিকার দিয়েছে। যেহেতু স্বামী-স্ত্রী প্রত্যেকের তনুদেহ ভিন্ন তাই একজনের সর্ববিষয় অপরজনের কাছে ভালো না লাগাই স্বাভাবিক।

উপরন্তু নারীদের বিষয়ে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

استوصوا بالنساء خيرا فإنهن خلقن من ضلع وإن أعوج شيء في الضلع أعلاه فإن ذهبت تقيمه كسرته.

অর্থ: হে পুরুষগণ! তোমরা নারীদের ব্যাপারে আমার কাছ থেকে কল্যাণের অসিয়ত গ্রহণ কর। নিশ্চয় তাদেরকে পাঁজরের বক্র হাঁড় থেকে সৃষ্টি করা হয়েছে। যদি তুমি তাকে সম্পূর্ণ সোজা করতে যাও তবে ভেঙ্গে ফেলবে। (সহীহ বুখারী; হা.নং ৫১৮৬)

অপর এক হাদীসে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নারীদের জ্ঞান-বুদ্ধি কম বলে অবহিত করেছেন। তাই পুরুষদেরকে ধৈর্য্যশীল হতে হবে। স্ত্রীদের বক্রতা আল্লাহর সৃষ্ট সৌন্দর্য্য মনে করতে হবে। তাদের মান-অভিমান সয়ে যেতে হবে। হাদীসে রাসূলের সাথে বিবিদের অনেক মান-অভিমানের ঘটনা বর্ণিত হয়েছে। যেমন একবার রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এক স্ত্রী হযরত আয়েশা সিদ্দীকার ঘরে রাসূলের জন্য একটা বাটিতে কিছু হাদিয়া পাঠিয়েছিলেন। এদিকে আয়েশা রাযি. এর ঘরে অন্য স্ত্রীর হাদিয়া

পাঠানোতে তাঁর অভিমান হল। তাই আয়েশা রাযি. খাবারের পাত্রটি ভেঙ্গে ফেললেন। কিন্তু রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এতে ক্ষিপ্ত হলেন না; বরং পড়ে যাওয়া খাবারগুলো নিজ হাতে একত্রিত করলেন এবং সেই পাত্রের পরিবর্তে আরেকটি পাত্র দিয়ে খাদেমকে জানিয়ে দিলেন, তোমাদের মায়ের অভিমান হয়েছে। (সহীহ বুখারী; হা.নং ৫২২৫)

এ ধরনের বহু ঘটনা রাসূলের জীবনে ঘটেছে যা থেকে আমাদের শিক্ষা গ্রহণ করা জরুরী।

৯. একাধিক বিবাহ

ইসলামের দৃষ্টিতে একাধিক বিবাহ নারীর প্রতি জুলুম করার উদ্দেশ্যে নয়। বরং নারীর অভিভাবকত্ব প্রদান ও তার হক আদায়ের জন্য এ ব্যবস্থা। নারীদের সংখ্যা পুরুষের তুলনায় বেশি হওয়ায় ভরণ-পোষণের সামর্থ্য ও তাদের মাঝে ইনসাফ প্রতিষ্ঠার শর্তে ইসলাম একাধিক বিবাহের অনুমতি দিয়েছে। উল্লিখিত শর্ত কারো মাঝে বিদ্যমান না থাকলে কেবল এক বিবি নিয়ে জীবন

যাপন করতে বলা হয়েছে। যে ব্যক্তি একাধিক বিবাহ করে আর স্ত্রীদের প্রতি ইনসাফ করে না, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদেরকে সতর্ক করে বলেন,

إذا كان عند الرجل امرأتان فلم يعدل بينهما جاء يوم القيامة وشقه ساقط.

অর্থ: যদি কারো দুজন বিবি থাকে আর সে তাদের মাঝে সমতা রক্ষা না করে তবে কিয়ামতের দিন সে পক্ষাঘাতগ্রস্থ হয়ে উঠবে। অর্থাৎ তার এক কাঁধ একদিকে ঝুঁকে থাকবে। (সুনানে তিরমিযী; হা.নং ১১৪১)

মা হিসেবে ইসলামে নারীর অধিকার ও অবস্থান

সময়ের সাথে সাথে একজন নারীর অবস্থার পরিবর্তন ঘটে প্রথমে সে থাকে পরিবারের কন্যা তারপরে বৈবাহিক সম্পর্কের পরে সে হয়ে যায় একজনের স্ত্রী এবং তার পরের যে অবস্থা তা হলো একজন নারীকে পরিপূর্ণতা দান করে সেই অবস্থাটা হলো মা একজন নারী যখন সন্তান জন্ম দেয় সন্তান গর্ভধারণ থেকে শুরু করে ভূমিষ্ঠ হওয়া লালন-পালন করা বুকের দুধ পান করানো এর সবকিছুর বিনিময়ে আল্লাহতালা নারীকে দিয়েছেন অধিক মর্যাদা এবং অসীম পরিমাণ নেকি একজন নারী যখন গর্ভধারণ করে তখন থেকে প্রতিটি মুহূর্তের জন্য সে সোয়াব পেতে থাকে আল্লাহ সুবহানাতায়ালা একজন মাকে সুমহান মর্যাদায় অধিষ্ট করেছেন একজন নারী যদি তার সন্তান জন্ম দিতে গিয়ে মৃত্যু হয় তবে এই মৃত্যুকে রাব্বুল আলামিন শহীদি মৃত্যু হিসাবে আখ্যা দিয়েছেন একজন শহীদের সমান মর্যাদা তাই একজন সন্তান ভূমিষ্ঠকারী মৃত মা আল্লাহ রাব্বুল আলামিন গর্ভধারণকালীন সময়ের নারীর আমলকে অধিক সওয়াব ও নেকি অধিকারী করেছেন একজন মা তার সন্তানকে ভূমিষ্ঠ করার পরে যতদিন পর্যন্ত বুকের দুধ পান করায় এবং ধৈর্যের সাথে এই কাজ করে তার বিনিময়েও আল্লাহ সুবহানাতায়ালা মাকে অপূর্ণ সওয়াব দান করে একজন মায়ের মর্যাদা এত বেশি যে যদি কোন সন্তান মায়ের অবাধ্য হয় তখন আল্লাহ তায়ালার আরশ কেঁপে ওঠে। বাবার সঙ্গে (সদাচরণের) নির্দেশ দিয়েছি। তার মা কষ্টের পর কষ্ট ভোগ করে তাকে গর্ভে ধারণ করে..."। হাদিসে রাসুল (সা.) বলেছেন, সদাচরণ পাওয়ার ক্ষেত্রে মায়ের অধিকার সবচেয়ে বেশি, এরপর বাবার।

وَ وَصَّيۡنَا الۡاِنۡسَانَ بِوَالِدَيۡهِ ۚ حَمَلَتۡهُ اُمُّهٗ وَهۡنًا عَلٰى وَهۡنٍ وَّ فِصٰلُهٗ فِىۡ عَامَيۡنِ اَنِ اشۡكُرۡ لِىۡ وَ لِوَالِدَيۡكَ ؕ اِلَىَّ الۡمَصِيۡرُ ﴿۱۴﴾

“'আমি মানুষকে তার মা-বাবার সঙ্গে (সদাচরণের) নির্দেশ দিয়েছি। তার মা কষ্টের পর কষ্ট ভোগ করে তাকে গর্ভে ধারণ করে। আর তার দুধ ছাড়ানো হয় দুই বছরে; সুতরাং আমার শুকরিয়া ও তোমার মা-বাবার শুকরিয়া আদায় করো”

(সুরা লুকমান, আয়াত: ১৪)

এখানে যখন পিতা-মাতার প্রতি কর্তব্য পালন এবং তাদের কৃতজ্ঞতা স্বীকারের নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে, তখন এর হেকমত ও অন্তর্নিহিত রহস্য এই বর্ণনা করেছেন যে,

তার মা ধরাধামে তার আবির্ভাব ও অস্তিত্ব বজায় রাখার ক্ষেত্রে অসাধারণ ত্যাগ স্বীকার ও অবর্ণনীয় দুঃখ-কষ্ট বরদাশত করেছেন। নয় মাস কাল উদরে ধারণ করে তার রক্ষণাবেক্ষণ করেছেন এবং এ কারণে ক্রমবর্ধমান দুঃখ-কষ্ট বরদাশত করেছেন। আবার ভূমিষ্ট হওয়ার পরও দু'বছর পর্যন্ত স্তন্যদানের কঠিন ঝামেলা পোহাতে হয়েছে। যাতে দিন-রাত মাকে কঠোর পরিশ্রম করতে হয়েছে। ফলে তার দুর্বলতা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেয়েছে। আর সন্তানের লালন-পালন করার ক্ষেত্রে মাকেই যেহেতু অধিক বুকি-ঝামেলা বহন করতে হয়, সেজন্য শরীয়তে মায়ের স্থান ও অধিকার পিতার অগ্রে রাখা হয়েছে। যদি পিতা-মাতার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা না হয় তাতে আল্লাহরও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা হয় না। হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, "যে কেউ মানুষের কাছে কৃতজ্ঞ হয় না সে আল্লাহর কাছেও কৃতজ্ঞ হতে পারে না।" [আবু দাউদ: ৪৮১১, তিরমিযী: ১৯৫৪, মুসনাদে আহমাদ: ২/২৯৫]

وَ قَضٰى رَبُّكَ اَلَّا تَعْبُدُوْۤا اِلَّاۤ اِيَّاهُ وَ بِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا ؕ اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ اَحَدُهُمَاۤ اَوْ كِلٰهُمَا فَلَا تَقُلْ لَّهُمَاۤ اُفٍّ وَّ لَا تَنْهَرْهُمَا وَ قُلْ لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيْمًا ﴿۲۳﴾

"তোমার প্রতিপালক আদেশ দিয়েছেন, তিনি ব্যতীত অন্য কারও ইবাদত না করতে এবং মাতা-পিতার সঙ্গে সদ্ব্যবহার করতে। তাঁদের একজন অথবা উভয়ে তোমার জীবদ্দশায় বার্ধক্যে উপনীত হলে তাঁদের 'উফ্' (বিরক্তিও অবজ্ঞামূলক কথা) বলবে না এবং তাঁদের ধমক দেবে না; তাঁদের সঙ্গে সম্মানসূচক কথা বলবে"

(সূরা বনি ইসরাঈল, আয়াত: ২৩-২৪)

এই আয়াতে মহান আল্লাহ তাঁর ইবাদতের পর দ্বিতীয় নম্বরে পিতা-মাতার সাথে সদ্ব্যবহার করার নির্দেশ দিয়েছেন। এ থেকে পিতা-মাতার আনুগত্য ও তাঁদের খেদমত করার এবং তাঁদের প্রতি আদব ও শ্রদ্ধা প্রদর্শন করার কত যে গুরুত্ব তা পরিষ্কার হয়ে যায়। অর্থাৎ, প্রতিপালকের প্রতিপালকত্বের দাবীসমূহের সাথে সাথে পিতা-মাতার দাবীসমূহ পূরণ করাও অত্যাবশ্যক। হাদীসসমূহেও এর গুরুত্ব এবং এর প্রতি চরম তাকীদ করা হয়েছে।

বিশেষ করে বার্ধক্যে তাঁদেরকে ‘উহ’ শব্দটিও বলতে এবং তাঁদেরকে ধমক দিতে নিষেধ করেছেন। কেননা, বার্ধক্যে তাঁরা দুর্বল ও অসহায় হয়ে যান। পক্ষান্তরে সন্তানরা হয় সবল এবং উপার্জন-সক্ষম ও (সংসারের সব কিছুর) ব্যবস্থাপক। এ ছাড়া যৌবনের উন্মাদনাময় উদ্যম এবং বার্ধক্যের ভুক্তপূর্ব স্নিগ্ধ ও উষ্ণ অভিজ্ঞতার মধ্যে সংঘর্ষ বাধে। এই সব অবস্থায় পিতা-মাতার প্রতি আদব ও শ্রদ্ধার দাবীসমূহের খেয়াল রাখার মুহূর্তটা হয় অতীব কঠিন। তাই আল্লাহর কাছে সন্তোষভাজন সেই-ই হবে, যে তাঁদের শ্রদ্ধার দাবী পূরণ ও প্রাপ্য অধিকার আদায়ের ব্যাপারে যত্নবান হবে।

يُوۡصِيۡكُمُ اللّٰهُ فِىۡۤ اَوۡلَادِكُمۡ * لِلذَّكَرِ مِثۡلُ حَظِّ الۡاُنۡثَيَيۡنِ‌ ۚ فَاِنۡ كُنَّ نِسَآءً فَوۡقَ اثۡنَتَيۡنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ‌ ۚ وَ اِنۡ كَانَتۡ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصۡفُ‌ ؕ وَ لِاَبَوَيۡهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنۡهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ اِنۡ كَانَ لَهٗ وَلَدٌ‌ ۚ فَاِنۡ لَّمۡ يَكُنۡ لَّهٗ وَلَدٌ وَّ وَرِثَهٗۤ اَبَوٰهُ فَلِاُمِّهِ الثُّلُثُ‌ ۚ فَاِنۡ كَانَ لَهٗۤ اِخۡوَةٌ فَلِاُمِّهِ السُّدُسُ مِنۡۢ بَعۡدِ وَصِيَّةٍ يُّوۡصِىۡ بِهَاۤ اَوۡ دَيۡنٍ‌ ؕ اٰبَآؤُكُمۡ وَ اَبۡنَآؤُكُمۡ لَا تَدۡرُوۡنَ اَيُّهُمۡ اَقۡرَبُ لَكُمۡ نَفۡعًا‌ ؕ فَرِيۡضَةً مِّنَ اللّٰهِ‌ ؕ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلِيۡمًا حَكِيۡمًا ﴿۱۱﴾

“আর পিতা-মাতা উভয়ের প্রত্যেকের জন্য (সন্তানের) সম্পদের এক–ষষ্ঠাংশ যদি তার সন্তান থাকে; আর যদি সন্তান না থাকে, তবে পিতা-মাতাই ওয়ারিশ বা উত্তরাধিকারী হবেন, এমতাবস্থায় তার মায়ের জন্য এক-তৃতীয়াংশ”

(সুরা নিসা, আয়াত: ১১)।

আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসুল (সা.)-কে জিজ্ঞাসা করা হলো, 'হে আল্লাহর রাসুল, সদাচার পাওয়ার ক্ষেত্রে কে সবচেয়ে বেশি অগ্রগণ্য?' তিনি বলেন, 'তোমার মা' (মুসলিম)।

عن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: (جَاءَ رَجُلٌ إلى رَسولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ فَقالَ: يا رَسولَ اللَّهِ، مَن أحَقُّ النَّاسِ بحُسْنِ صَحَابَتِي؟ قالَ: أُمُّكَ قالَ: ثُمَّ مَنْ؟ قالَ: ثُمَّ أُمُّكَ قالَ: ثُمَّ مَنْ؟ قالَ: ثُمَّ أُمُّكَ قالَ: ثُمَّ مَنْ؟ قالَ: ثُمَّ أبُوكَ)

আবু হুরায়রা (রা.) থেকে আরও বর্ণিত, রাসুল (সা.)-কে জিজ্ঞাসা করা হলো, 'কে সবচেয়ে বেশি হকদার (সদ্ব্যবহার পাওয়ার)?' তিনি বলেন, 'তোমার মা', তারপর 'তোমার মা', তারপর 'তোমার মা', তারপর 'তোমার বাবা' (বুখারি, মুসলিম)

১. গর্ভধারণের মর্য়াদা

وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَتِيكٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الشَّهَادَةُ سَبْعٌ سِوَى الْقَتْلِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ: الْمَطْعُونُ شَهِيدٌ وَالْغَرِيقُ شَهِيدٌ وَصَاحِبُ ذَاتِ الْجَنْبِ شَهِيدٌ وَالْمَبْطُونُ شَهِيدٌ وَصَاحِبُ الْحَرِيقِ شَهِيدٌ وَالَّذِي يَمُوتُ تَحْتَ الْهَدْمِ شَهِيدٌ وَالْمَرْأَةُ تَمُوتُ بِجُمْعٍ شَهِيدٌ . رَوَاهُ مَالك وَأَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيّ

জাবির ইবনু 'আতীক (রাঃ)থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ আল্লাহর রাহে যুদ্ধ করে নিহত শাহীদ ছাড়াও সাত ধরনের শাহীদ রয়েছে। এরা হচ্ছে (১) মহামারীতে আক্রান্ত হয়ে মৃত ব্যক্তি, (২) পানিতে ডুবে মারা যাওয়া ব্যক্তি, (৩) যা-তুল জান্ব রোগে মারা যাওয়া ব্যক্তি, (৪) পেটের রোগে মারা যাওয়া ব্যক্তি, (৫) অগ্নিদগ্ধ হয়ে মারা যাওয়া ব্যক্তি, (৬) কোন প্রাচীর চাপা পড়ে মৃত ব্যক্তি এবং (৭) প্রসবকালে মৃত্যুবরণকারী মহিলা। (মালিক, আবূ দাঊদ, নাসায়ী)

মাতৃত্ব একটি শিশুকে বড় করার পাশাপাশি মায়ের নিজের রূপান্তরের গল্প। এটি শারীরিক ক্লান্তি, প্রসবোত্তর মানসিক চাপ, রাত জেগে শিশুর দেখাশোনা এবং সন্তানের জন্য সর্বোত্তম চাওয়ার অবিরাম প্রচেষ্টার মধ্য দিয়ে গড়ে ওঠে। এই যাত্রায় মায়েরা প্রায়ই নিঃসঙ্গতা ও দুশ্চিন্তায় ভোগেন। এমন সময়ে ইসলামের শিক্ষা মায়েদের জন্য এক অমূল্য আশ্রয়।

এই আয়াত মায়ের শারীরিক ও মানসিক কষ্টের প্রতি আল্লাহর দৃষ্টি এবং তাঁর কাছে এর মূল্য তুলে ধরে। সুরা লুকমানে বলা হয়েছে, 'আমি মানুষকে তার পিতা-মাতার প্রতি নির্দেশ দিয়েছি। তার মা তাকে কষ্টের পর কষ্ট সহ্য করে গর্ভে ধারণ করেছে...

সুতরাং আমার এবং তোমার পিতা-মাতার প্রতি কৃতজ্ঞ হও।' (সুরা লুকমান, আয়াত: ১৪)

একজন গর্ভবতী নারী শারীরিক ও মানসিক যন্ত্রণায় ভোগেন, নানা রকম সমস্যার মধ্য দিয়ে দীর্ঘ ৯ মাস সময় পার করেন—এসব কষ্টের বিনিময় আল্লাহ তাআলা অবশ্যই তাঁকে দান করবেন। কোনো মুসলিমের গায়ে একটি ছোট কাঁটা বিঁধে ব্যথা পেলেও আল্লাহ তার বিনিময়ে গুনাহ মাফ করে দেন। সেই তুলনায় সন্তান গর্ভধারণ ও প্রসবযন্ত্রণা অনেক বেশি কষ্টের কাজ; নিশ্চয়ই তার বিনিময়ও হবে বহু গুণ বেশি। এমনকি এক হাদিসে এসেছে, 'যে নারী গর্ভাবস্থায় মারা যান, তিনি শহীদ।' (আবু দাউদ, হাদিস: ৩১১১)

একইভাবে অন্য আয়াতে আল্লাহ তাআলা বলেন, 'আমি মানুষকে নির্দেশ দিয়েছি তার মা-বাবার প্রতি সদয় আচরণের। তার মা নিদারুণ কষ্টে তাকে গর্ভে ধারণ করেন এবং নিদারুণ কষ্ট সহ্য করে তাকে প্রসব করেন। তাকে গর্ভে ধারণ করতে এবং দুধপান ছাড়াতে সময় লাগে ত্রিশ মাস। অবশেষে সে যখন পূর্ণ শক্তি লাভ করে এবং চল্লিশ বছরে পৌঁছে যায়, তখন সে বলে, 'হে আমার প্রতিপালক, আপনি আমাকে আর আমার মা-বাবাকে যে নেয়ামত দিয়েছেন, তার জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করার শক্তি আমাকে দান করুন...।' (সুরা আহকাফ, আয়াত: ১৫)

২. মাতৃত্বের মর্যাদা

মাতৃত্বের মর্যাদা এতই বেশি যে মহান আল্লাহ তাঁর নবীদেরও মায়ের প্রতি শ্রদ্ধাশীল ও অনুগত হওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন। পবিত্র কোরআনে ইসা (আ.)-এর বক্তব্য তুলে ধরতে গিয়ে এরশাদ হয়েছে, 'আর আমাকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, আমি যেন আমার মায়ের প্রতি সদ্ব্যবহার করি। আমাকে করা হয়নি উদ্ধত-অবাধ্য ও দুর্ভাগা-হতভাগ্য।' (সুরা মারইয়াম, আয়াত: ৩০-৩২)

৩. মায়ের দোয়া

তিন ব্যক্তির দোয়া অবশ্যই কবুল হয়, এতে কোনো সন্দেহ নেই। তারা হলেন—মা-বাবার দোয়া তার সন্তানের জন্য, মুসাফিরের দোয়া এবং অত্যাচারিত ব্যক্তির দোয়া অত্যাচারীর বিরুদ্ধে (সুনানে আবু দাউদ-১৫৩৮)।

একজন নারীর মা হওয়া আসলেই অনেক সৌভাগ্যের বিষয় একজন নারীর মা হওয়ার ফলে তার মাঝে মমতাময়ী ভাব আরো বেশি দায়িত্বশীলতা সন্তানকে নৈতিক শিক্ষা সদাচরণ শেখানো ইত্যাদির দায়িত্ব গুলো অর্পিত হয়। ইসলামে এর মর্যাদা অপরিসীম ও অতুলনীয়

মায়ের দোয়া আল্লাহর কাছে অত্যন্ত শক্তিশালী এবং দ্রুত কবুল হয়। এটি একটি নিশ্চিত বিষয় যে, মায়ের দোয়া মিস হবে না। মায়ের দোয়া সন্তানকে সকল বিপদ ও খারাপ থেকে রক্ষা করে এবং দুনিয়া ও আখিরাতে তার জন্য কল্যাণ বয়ে আনে।

কোরআনে বর্ণিত দোয়া: "রব্বির হামহুমা, কামা রাব্বায়ানি সাগিরা।" (হে আমার প্রতিপালক! তাদের প্রতি রহম করো যেমন তারা আমাকে শৈশবে লালন-পালন করেছিল)।

ইসলামে নারীর কর্মের অধিকার ও অবস্থান

ইসলাম নারীকে কখনো অর্থনৈতিক দিক থেকেও পিছিয়ে রাখেন নাই একজন নারী যদি পরিপূর্ণ পর্দা ও ইজ্জত সম্মানের হেফাজত করে ঘরে বসে

কোন হালাল কাজ ব্যবসা করতে চাই এক্ষেত্রে ইসলামে কোন নিষেধ আজ্ঞা নেই একজন স্ত্রী ও যদি এই কাজগুলো করতে চাই সে ক্ষেত্রে তার স্বামী যদি রাজি থাকেন তাহলে একজন স্ত্রী ও অর্থনৈতিক কর্মকান্ডে জড়িত থাকতে পারবে উম্মুল মু'মিনীন খাদিজা রাদিয়াল্লাহু আনহু একজন দৃষ্টান্ত তিনি নিজের ঘরে অবস্থান করে বড় মাপের ব্যবসা পরিচালনা করতেন রাসূল সাল্লাল্লাহু সাল্লাম স্বয়ং নিজে তার ব্যবসা দেখভাল ও দায়িত্ব

পালন করতেন একজন নারী অবশ্যই ইলম অর্জন করবে একজন পুরুষের জন্য ইসলামী জ্ঞান অর্জন করা যেমন ফরজ সেই ক্ষেত্রে একজন নারীর জন্য ইসলামী জ্ঞান অর্জন করা ফরজ এবং এই জ্ঞান এর বিস্তার ঘটানোর জন্য একজন নারী শিক্ষিকা হতে পারেন অবশ্যই সেখানে ইসলামী পরিপূর্ণ পর্দা এবং শুধু মহিলা দ্বারা পরিচালিত প্রতিষ্ঠান হতে হবে।

ইসলাম সর্বদা নারীদের শালীন পরিবেশে শিক্ষা, কাজ ও চলাফেরার কথা বলে। শরিয়ত নির্ধারিত গণ্ডির মধ্যে থেকে নারীরা অবশ্যই শিক্ষা অর্জনসহ অর্থনৈতিক ও সামাজিক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ করতে পারবে। ইসলাম কোথাও নারীকে বন্দি করে রাখার কথা বলেনি। ইসলাম নারী শিক্ষার প্রতি যেমন গুরুত্বারোপ করেছে তেমনি নারী-পুরুষের ভোটাধিকারেও কোনো ধরনের পার্থক্য সৃষ্টি করেনি। এমনকি ইসলাম নারীকে অর্থনৈতিকভাবে স্বাবলম্বী হতে কাজ ও ব্যবসা-বাণিজ্যের অধিকারও প্রদান করেছে।

কোরআনে কারিমের সূরা বাকারার ১৮৬ নম্বর আয়াতে বলা হয়েছে, ‘আমি ব্যবসাকে হালাল করেছি এবং সুদকে হারাম করেছি।’ এই আয়াতে ব্যবসা হালাল হওয়া এবং সুদ হারাম হওয়া নারী-পুরুষের জন্য সমভাবে প্রযোজ্য। একজন পুরুষ হালাল পন্থায় যেসব ব্যবসা করতে পারবে। নারীও সে ধরনের ব্যবসা করতে পারবে। সে বিবাহিত হোক কিংবা অবিবাহিত হোক। সে তার অর্জিত সম্পদের ওপর পূর্ণ নিয়ন্ত্রণকারী। সে কোনো বিধিনিষেধ ছাড়াই তার সম্পত্তির ব্যাপারে সব ধরনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারে, যা একজন পুরুষের জন্যও প্রযোজ্য।

কোরআন ও হাদিসের কোনো স্থানে নারীর কাজকর্মের ব্যাপারে কোনো নিষেধ আরোপিত হয়নি। শুধু দু’টি বিষয়ের প্রতি সঙ্গত কারণে নির্দেশ দিয়েছে। শর্ত দু’টি হলো প্রথমত, ব্যবসা হতে হবে হালাল পদ্ধতিতে ও শরিয়ত নির্ধারিত সীমারেখার মধ্যে। দ্বিতীয়ত,

পর্দা রক্ষা করতে হবে। তাছাড়া ইসলাম নারীদের সৌন্দর্য প্রদর্শনকারী কোনো পেশায় নিয়োজিত হতেও নিষেধ করেছে।

এ ছাড়া শরিয়ত অনুমোদিত সব ব্যবসা বা কাজ করার অনুমতি দিয়েছে ইসলাম। এখানে ভুল বোঝাবুঝির কোনো অবকাশ নেই। এখানে একটি কথা বলে রাখা ভালো, ইসলাম কিন্তু নারীদের কোনো আয়-রোজগারের দায়িত্ব দেয়নি। দেয়নি পরিবার লালন-পালন ও ভরণ-পোষণের কর্তব্য। ইসলামের পারিবারিক ব্যবস্থায় গোটা পরিবারের অর্থনৈতিক প্রয়োজন ও চাহিদা পূরণের দায়িত্ব একমাত্র পুরুষের।

ইসলামে নারীর অর্থনৈতিক অধিকার ও অবস্থান

ইসলাম একজন নারীর হকের বিষয়ে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে যা কিনা অন্য কোন ধর্মগ্রন্থের করা হয়নি আল্লাহ সুবহানাতায়ালা নারীদের বিষয়ে পবিত্র কুরআনে অনেক আয়াত নাযিল করেছেন রাসুল সাঃ নিজেও নারীদের হকের ব্যাপারে অনেক হাদিস ঘোষণা করেছেন নারীদেরকে তার সম্পদের পরিপূর্ণ হক দেয়ার জন্য কুরআনে প্রচুর আয়াত নাজিল হয়েছে এবং এই হক থেকে যদি নারীদেরকে বঞ্চিত করা হয় তবে কেয়ামতে তার জন্য কঠিন শাস্তি অবধারিত রয়েছে।

কুরআনে উল্লেখ করা হয়েছে যে, একজন স্ত্রী স্বামীর সম্পত্তির অংশ পাবেন—সন্তান থাকলে এক-অষ্টমাংশ, আর সন্তান না থাকলে এক-চতুর্থাংশ। এর বাইরেও নারীদের সম্পত্তি অর্জন, ধারণ এবং তা নিজের ইচ্ছামতো ব্যবহার করার অধিকার আছে।

সূরা আন-নিসা (৪:১১): এই আয়াতে উত্তরাধিকারের বিধান বর্ণনা করা হয়েছে। এখানে বলা হয়েছে, "পুত্রসন্তানদের জন্য অংশ রয়েছে যা তারা রেখে গেছে, এবং কন্যাদের জন্যও অংশ রয়েছে যা তারা রেখে গেছে। (এই অংশগুলো) নির্ধারিত। যদি কোনো পুরুষ বা নারীর সন্তান না থাকে এবং তার একজন পিতা-মাতা থাকে, তাহলে তার মাতা ছয় ভাগের এক ভাগ পাবে। আর যদি তার ভাইবোনেরা থাকে, তাহলে তার মাতা ছয় ভাগের এক ভাগ পাবে, (এই সব ভাগ বন্টন হবে) এই অসিয়ত পূর্ণ করার পর অথবা (কোনো) ঋণ পরিশোধ করার পর। তোমরা জান না তোমাদের মধ্যে কে উপকারিতায় অধিক নিকটবর্তী। এই বিধানগুলো আল্লাহর পক্ষ থেকে (নির্ধারিত)। নিশ্চয়ই আল্লাহ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়।"

সূরা আন-নিসা (৪:৭): এই আয়াতে বলা হয়েছে, "পুরুষদের জন্য (সম্পত্তিতে) অংশ রয়েছে যা তারা রেখে গেছে, এবং নারীদের জন্য (সম্পত্তিতে) অংশ রয়েছে যা তারা রেখে গেছে। (এই অংশগুলো) নির্ধারিত।"

হাদিসে নারীর অধিকার: নবী মুহাম্মদ (সা.) কর্তৃক নারীর প্রতি সম্মান ও অধিকারের অনেক কথা বলা হয়েছে। তিনি বলেছেন, "তোমরা নারীদের প্রতি সদয় হবে।"

উত্তরাধিকারের অধিকার: হাদিসেও উত্তরাধিকারের অধিকার নিশ্চিত করা হয়েছে। যেমন, একজন মুসলিম নারী তার স্বামীর উত্তরাধিকার হিসেবে সম্পত্তি পাবেন।

ব্যক্তিগত মালিকানা: একজন নারী তার নিজের সম্পত্তি, যেমন - মোহরানা, দান, উত্তরাধিকার ইত্যাদি থেকে প্রাপ্ত সম্পত্তি নিজের ইচ্ছায় ব্যয় করতে পারেন।

ইসলামিক আইন অনুযায়ী, নারীরা তাদের অর্জিত সম্পত্তি নিজের ইচ্ছামত ব্যবহার করতে পারে, যা তাদের আর্থিক স্বাধীনতা নিশ্চিত করে।

সমাজ বা অন্য কোনো ব্যক্তির হস্তক্ষেপ ছাড়াই নারীরা তাদের সম্পত্তি নিজেদের প্রয়োজনে ব্যবহার করতে পারে।

নারীর সম্পত্তিতে অধিকারের এই বিধানগুলো সমাজে নারীর মর্যাদা ও সম্মান প্রতিষ্ঠা করতে সাহায্য করে।

পিতা-মাতার অংশ:

যদি মৃত ব্যক্তির কোনো সন্তান থাকে, তাহলে মা সম্পত্তির ১/৬ অংশ (এক ষষ্ঠাংশ) পাবেন।

যদি মৃত ব্যক্তির স্বামী বা স্ত্রীর সাথে পিতা-মাতা উভয়েই থাকেন, তাহলে স্বামী বা স্ত্রীর অংশ দেওয়ার পর মা বাকি সম্পত্তির ১/৩ অংশ পাবেন।

স্বামী ও স্ত্রীর অংশ:

স্ত্রীর যদি কোনো সন্তান থাকে, তাহলে স্বামী তাঁর সম্পত্তির ১/৪ অংশ পাবেন।

স্ত্রীর যদি কোনো সন্তান না থাকে, তাহলে স্বামী তাঁর সম্পত্তির ১/২ অংশ পাবেন।

পুত্র ও কন্যার অংশ:

সাধারণত, ছেলেমেয়েরা দ্বিগুণ অংশ পায়। অর্থাৎ, ছেলে ২ অংশ পেলে মেয়ে ১ অংশ পাবে।

যদি মাত্র একজন কন্যা থাকে এবং কোনো পুত্র না থাকে, তবে কন্যাটি সম্পত্তির ১/২ অংশ পাবেন।

পবিত্র কোরআনে আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿ يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ ۖ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ۚ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۖ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ ۚ فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ ۚ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ ۚ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۗ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا ۚ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴾

‘আল্লাহ তোমাদেরকে তোমাদের সন্তানদের সম্পর্কে নির্দেশ দিচ্ছেন, এক ছেলের জন্য দুই মেয়ের অংশের সমপরিমাণ। তবে যদি তারা দুইয়ের অধিক মেয়ে হয়, তাহলে তাদের জন্য হবে, যা সে রেখে গেছে তার তিন ভাগের দুই ভাগ; আর যদি একজন মেয়ে হয় তখন তার জন্য অর্ধেক। আর তার মাতা পিতা উভয়ের প্রত্যেকের জন্য ছয় ভাগের

এক ভাগ সে যা রেখে গেছে তা থেকে, যদি তার সন্তান থাকে। আর যদি তার সন্তান না থাকে এবং তার ওয়ারিস হয় তার মাতা পিতা তখন তার মাতার জন্য তিন ভাগের এক ভাগ। আর যদি তার ভাই-বোন থাকে তবে তার মায়ের জন্য ছয় ভাগের এক ভাগ। অসিয়ত পালনের পর, যা দ্বারা সে অসিয়ত করেছে অথবা ঋণ পরিশোধের পর। তোমাদের মাতা পিতা ও তোমাদের সন্তান-সন্ততিদের মধ্য থেকে তোমাদের উপকারে কে অধিক নিকটবর্তী তা তোমরা জান না। আল্লাহর পক্ষ থেকে নির্ধারিত। নিশ্চয় আল্লাহ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়। (সুরা নিসা ১১)

মহান আল্লাহ এ এক আয়াতে পুরো উত্তরাধিকার আইন সম্পর্কে আলোকপাত করেছেন

নারীর সামাজিক অধিকার ও অবস্থানে ইসলাম

সামাজিকভাবে রব্বুল আলামিন একজন নারীকে মর্যাদার শীর্ষ আসনে বসিয়েছেন নারীর দায়িত্ব সম্পর্ক ও সামাজিকতার ভিত্তিতে আল্লাহ সুবহানাতায়ালার কাছে নারী বিভিন্ন সময় বিভিন্নভাবে মর্যাদা লাভ করেছে। ইসলাম ফুফু খালা দের সাথে সদ্ব্যবহার সদাচরণ করার ক্ষেত্রে জোরদার দিয়েছেন আত্মীয়তার হক রক্ষায় ইসলাম সর্বদা সচেষ্ট আল্লাহ সুবহানাতায়ালা আত্মীয়তার হককে অনেক মর্যাদাবান করেছেন এবং এই হকের ব্যাপারে তার বান্দাদেরকে সতর্ক করেছেন সকলের হক যাতে সমানভাবে আদায় করা হয় তার দিকে গুরুত্ব দিতে বলেছেন ।

বিবাহের মাধ্যমে সামাজিক অধিকার:জাহিলী যুগে বৈবাহিক ক্ষেত্রে নারীদের কোনরূপ অধিকার ছিল না। তারা শুধু পুরুষের ভোগের সামগ্রী ছিল। ইসলাম এহেন ঘৃণিত প্রথার মূলোৎপাটন করতঃ নারী ও পুরুষের বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপনের নির্দেশ দিয়েছে। এ মর্মে আল্লাহ তা‘আলা এরশাদ করেন,

فَانْكِحُواْ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلاَثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تَعْدِلُواْ فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلاَّ تَعُوْلُواْ-

‘তবে যেসব নারী তোমাদের পসন্দ হয়, তাদের মধ্য থেকে দুই দুই, তিন তিন, চার চার জনকে বিবাহ কর। কিন্তু তোমাদের মনে যদি আশংকা জাগে যে, তোমরা তাদের সাথে ইনসাফ করতে পারবে না। তাহ’লে একজন স্ত্রী গ্রহণ কর অথবা তোমাদের দাসীদেরকে স্ত্রী হিসাবে গ্রহণ কর। অবিচার হ’তে বাঁচার জন্য এটাই অধিক সঠিক কাজ’ (নিসা ৩)।

স্বামী নির্বাচনের স্বাধীনতায় নারীকে অধিকার ও মর্যাদা দান :

ইসলামের আবির্ভাবের পূর্বে নারীদের পসন্দমত স্বামী গ্রহণের কোন অধিকার ছিল না। যখন-তখন তাদেরকে পাত্রস্থ করা হ’ত। কিন্তু ইসলাম নারীকে স্বামী নির্বাচনের স্বাধীনতা দিয়েছে। যে কেউ ইচ্ছা করলে বলপূর্বক কোন নারীর স্বামী হ’তে পারবে না। আল্লাহ

তা‘আলা বলেন, فَلاَ تَعْضُلُوْهُنَّ أَن يَنْكِحْنَ ‘হে পুরুষরা! তোমরা মহিলাদেরকে (স্বীয় স্বামী নির্বাচন করে) বিয়ে করাতে বাধা প্রদান করো না’ (বাক্বারাহ ২৩২)।

হাদীছে এরশাদ হয়েছে,

عِنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ تُنْكَحُ الْأَيِّمُ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ وَلاَ تُنْكَحُ الْبِكْرُ حَتَّى تُسْتَأْذَنُ قَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللهِ وَكَيْفَ إِذْنُهَا قَالَ أَنْ تَسْكُتَ-

আবু হুরায়রা (রাঃ) হ’তে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, ‘স্বামীহীনা নারীর বিবাহ তার অনুমতি ব্যতীত দেওয়া যাবে না। কুমারীর বিবাহ তার সম্মতি ব্যতীত দেওয়া চলবে না। তারা (উপস্থিত ছাহাবায়ে কেরাম) জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহর রাসূল (ছাঃ)! কুমারীর সম্মতি কিরূপে (নেওয়া যাবে)? উত্তরে তিনি বললেন, তার নীরবতাই সম্মতি’

১. মোহর দানের মাধ্যমে নারীর অধিকার ও মর্যাদা

ইসলাম নারীর মর্যাদার স্বীকৃতি স্বরূপ বিবাহের ক্ষেত্রে মোহর প্রদান অপরিহার্য করে দিয়েছে। আল্লাহ তা‘আলা বলেন, وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً ‘তোমরা তোমাদের স্ত্রীদেরকে মোহর দিয়ে দাও সন্তুষ্টির সাথে’ (নিসা ৪)। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, ‘যে শর্তটি পূরণ করা সবচেয়ে যরূরী তাহ’ল ঐ শর্ত- যা দ্বারা তোমরা (স্ত্রীর) লজ্জাস্থান হালাল করো’। অর্থাৎ ‘মোহর’।

২. সহবাসের ক্ষেত্রে নারীকে অধিকার ও মর্যাদা দান

সহবাসের ক্ষেত্রে নারীর শারীরিক কষ্টের বিষয়টি খেয়াল রেখে ঋতুস্রাব অবস্থায় স্ত্রীর সাথে মেলামেশা ইসলাম নিষিদ্ধ করেছে। আল্লাহ বলেন,

وَيَسْأَلُوْنَكَ عَنِ الْمَحِيْضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُواْ النِّسَاءَ فِي الْمَحِيْضِ وَلاَ تَقْرَبُوْهُنَّ حَتَّىَ يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوْهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللهُ إِنَّ اللهَ يُحِبُّ التَّوَّابِيْنَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِيْنَ-

‘হে রাসূল (ছাঃ)! লোকেরা আপনার নিকট মহিলাদের স্রাব সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে। আপনি বলে দিন, এটা অশুচি জনিত কষ্টদায়ক বিষয়। অতএব তোমরা ঋতুস্রাব চলাকালীন মহিলাদের সাথে সহবাস থেকে বিরত থাক। তারা পবিত্র হওয়া পর্যন্ত তোমরা তাদের নিকটে যেও না। যখন তারা (সম্পূর্ণরূপে) পবিত্র হবে তখন তোমরা তাদের কাছে যাও, যেভাবে আল্লাহ তা‘আলা তোমাদেরকে হুকুম করেছেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ তওবাকারী ও পবিত্রতা অর্জনকারীকে ভালবাসেন’ (বাক্বারাহ ২২২)।

পায়ুপথে সহবাস করা হারাম। তবে পুরুষরা স্ত্রীদের যৌনাঙ্গে যেদিক থেকে ইচ্ছা সহবাস করতে পারে। আল্লাহ এ প্রসঙ্গে বলেন,نِسَآؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأْتُوْا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ ‘তোমাদের স্ত্রীরা তোমাদের জন্য শস্যক্ষেত্র স্বরূপ। অতএব তোমাদের যেভাবে ইচ্ছা সেভাবে শস্যক্ষেত্রে গমন কর’ (বাক্বারাহ ২২৩)।

হাদীছে এসেছে,

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ كَانَتِ الْيَهُوْدُ تَقُوْلُ إِذَا أَتَى الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ مِنْ دُبُرِهَا فِيْ قُبُلِهَا كَانَ الْوَلَدُ أَحْوَلَ فَنَزَلَتْ نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوْا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ-

জাবির (রাঃ) হ’তে বর্ণিত, তিনি বলেন যে, ইহুদীরা বলত, পুরুষ যদি পশ্চাৎদিক হ’তে স্ত্রীর যৌনাঙ্গে সঙ্গম করে তাহ’লে সন্তান ট্যারা হয়। (তাদের এ ভ্রান্ত ধারণা নিরসনের উদ্দেশ্যে) কুরআন মাজীদের এ আয়াত نِسَآؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأْتُواْ حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ ‘তোমাদের স্ত্রীগণ তোমাদের শস্যক্ষেত্র। অতএব তোমরা তোমদের শস্যক্ষেত্রে যেভাবে ইচ্ছা গমন করতে পার’ (বাক্বারাহ ২২৩)’।

৩. ভ্রমণের অধিকার

নারী তার মাহরামকে সাথে নিয়ে সকল স্থানে ভ্রমণ করতে পারবেন এতে ইসলামে কোন নিষেধাজ্ঞা জারি করা নেই পর্দা রক্ষা করে মাহরাম কে সাথে নিয়ে একজন নারী হজ্ব ওমরা মত গুরুত্বপূর্ণ ফরজগুলো ও সুন্নত গুলো আদায় করতে পারবে। আমাদের প্রিয় রসূল যখন কিনা কোন সফরে যেতেন তখন তিনি তার সাথে তার কোন একজন সহ ধর্মীনিকে সফর সঙ্গী হিসেবে নিয়ে যেতেন।রাসুল (সা.)-এর যুগে নারীর মর্যাদা অত্যন্ত উচ্চ ছিল। খাদিজা (রা.) একজন সফল ব্যবসায়ী এবং রাসুল (সা.)-এর সঙ্গী ছিলেন। আয়েশা (রা.) হাদিসের জ্ঞানে অগ্রণী ছিলেন। ফাতিমা (রা.) পিতার প্রিয় কন্যা হিসেবে সম্মান পেয়েছেন। এই নারীরা তৎকালীন সমাজে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। বাংলাদেশে এই উদাহরণ থেকে শিক্ষা নিয়ে নারীর মর্যাদা বাড়ানো সম্ভব। ইসলামী শিক্ষা এই নারীদের জীবন থেকে অনুপ্রেরণা প্রদান করেছেন।

৪. ইসলামে নারীর মানবিক মর্যাদা

ইসলাম নারীকে পুরুষের সমান মানুষ হিসেবে বিবেচনা করে। কুরআনে বলা হয়েছে, “হে মানুষ! আমি তোমাদেরকে এক পুরুষ ও এক নারী থেকে সৃষ্টি করেছি” (সূরা হুজুরাত: ১৩)। এটি নারী ও পুরুষের সমতার প্রমাণ। ইসলামী শিক্ষা নারীকে সম্মান ও মর্যাদা প্রদান করে। রাসুল (সা.) নারীর প্রতি সদাচরণের উপর জোর দিয়েছেন। তবে, সামাজিক কুসংস্কারের কারণে নারীকে কখনো কখনো নিম্ন মর্যাদায় বিবেচনা করা হয়। ইসলামে নারীকে মানবতার অংশ হিসেবে গণ্য করা হয়, যারা পুরুষের পাশাপাশি সমাজ গঠনে অবদান রাখে। নারীরা শিক্ষা, চাকরি ক্ষেত্রে স্বাধীনভাবে অংশ নিচ্ছে, যা ইসলামী মূল্যবোধের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। নারীর মানবিক মর্যাদা ইসলামের একটি মৌলিক শিক্ষা।

ইসলামে নারীর শিক্ষার অধিকার

কোরআনে সর্বপ্রথম নাজিলকৃত কথা এটাই ছিল 'ইকর' অর্থাৎ পড়ো জ্ঞান অর্জন করা সবার জন্য ফরজ ইসলামী জ্ঞান ব্যতীত কোন জাতি উন্নতির শিষ্যে পৌঁছতে পারে না। ইসলাম একটি পরিপূর্ণ জীবন ব্যবস্থা। একজন নর এবং নারী উভয়েরই ইসলামী জ্ঞানের আলোয় আলোকিত থাকতে হবে। একজন নারী তার পরিবারের একজন অন্যতম মুখ্য সদস্য। যখন শিশু প্রথম কথা শেখে সে তার মায়ের কাছ থেকেই কথা শেখে। সন্তানের প্রথম জ্ঞান দান করে তার মা এজন্য যেমন একজন পুরুষের জন্য ইলম অর্জন করা ফরজ তেমনভাবেই একজন মহিলার জন্য ইলম অর্জন করা ফরজ। ইসলামের জ্ঞান ব্যতীত জীবন কখনো আলোকিত হতে পারেনা সহীহ শুদ্ধ ভাবে কোরআন তিলাওয়াত করা আরবি ভাষা বোঝা কোরআনের ভাষা বোঝা এবং ইসলামিক যে বিষয়গুলো রয়েছে। মাসালা মাসায়েলের বিষয়গুলো সেগুলো সম্পর্কে পরিপূর্ণ ধারণা থাকা। একান্ত জরুরী ইসলামের জ্ঞান ছাড়া কখনোই একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা পরিচালনা করা সম্ভব নয়। এই জন্যই একজন নারীর ইলম অর্জন করা আবশ্যক ইলম সম্পর্কে কোরআন এবং হাদিসে অসংখ্য বর্ণনা পাওয়া গিয়েছে। ইসলাম একজন নারীকে পরিপূর্ণ এই অর্জনের অধিকার প্রদান করেছে নিষেধাজ্ঞা বা বাধা নেই একজন পরিপূর্ণ ইলম অর্জনকারী মা তার সন্তানদেরকে পরিপূর্ণ ইসলাম এর জ্ঞান দান করতে সক্ষম। একজন পরিপূর্ণ ইসলামী জ্ঞানে জ্ঞ্যানান্বিত মা তার সন্তানকে উত্তম ও আদর্শ ভাবে লালন-পালন করতে পারে। পবিত্র কুরআন এবং হাদিস অনুযায়ী, নারীদেরও নিজেদের জ্ঞান বৃদ্ধি এবং তা অর্জন করা বাধ্যতামূলক। ইসলামের দৃষ্টিতে নারী-পুরুষ উভয়েই রবের কাছে সমান এবং তাদের উভয়ের জন্যই জ্ঞানার্জন ফরজ।

১. ইসলামের দৃষ্টিতে নারী শিক্ষার গুরুত্ব

জ্ঞানার্জন ফরজ: ইসলামে প্রত্যেক মুসলিম নর ও নারীর জন্য জ্ঞান অন্বেষণ করা ফরজ, যা নারী শিক্ষার গুরুত্বকে তুলে ধরে।

কুরআনের নির্দেশ: পবিত্র কুরআনে মানুষকে পড়ার, চিন্তা করার এবং গবেষণা করার আদেশ দেওয়া হয়েছে, যা নারী-পুরুষ উভয়ের জন্যই প্রযোজ্য।

পার্থক্যহীন সমান অধিকার: ইসলাম নারী-পুরুষের মধ্যে কোনো পার্থক্য না করে উভয়কে সমভাবে জ্ঞানার্জনের আদেশ দিয়েছে।

শিক্ষার পরিবেশ: পুরুষের মতো নারীর জন্যও শিক্ষার পরিবেশ এবং সিলেবাসের ভিন্নতা থাকতে পারে, তবে উভয় শিক্ষার ভিত্তি এক ও অভিন্ন।

ঐতিহাসিক ভিত্তি: হযরত মুহাম্মদ (সা.) ১৪০০ বছর আগেই নারী-পুরুষ নির্বিশেষে শিক্ষা গ্রহণকে ফরজ বলে ঘোষণা করেছেন এবং শিক্ষাক্ষেত্রে নারীর অধিকারকে স্বীকৃতি দিয়েছেন।

আল্লাহ বলেন,

﴿ وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا ﴾ (طه: ١١٤)

অর্থাৎ বল, হে আমার প্রতিপালক! আমার জ্ঞান বৃদ্ধি কর। (ত্বা-হা ১১৪ আয়াত)

তিনি অন্যত্র বলেন,

﴿قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ﴾ (الزمر: ٩)

অর্থাৎ বল, যারা জানে এবং যারা জানে না তারা কি সমান? (যুমার ৯ আয়াত)

আল্লাহ আরও বলেন,

﴿يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ ﴾ (المجادلة: ١١)

অর্থাৎ যাদেরকে জ্ঞান দান করা হয়েছে আল্লাহ তাদেরকে বহু মর্যাদায় উন্নত করবেন। (মুজাদালা ১১ আয়াত)

তিনি অন্য জায়গায় বলেন,﴾

﴿إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ﴾ (فاطر: ٢٨)

অর্থাৎ আল্লাহর বান্দাদের মধ্যে জ্ঞানীরাই তাঁকে ভয় করে থাকে। (ফাত্বের ২৮ আয়াত)

আবূ হুরায়রাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ সোনা-রুপার খনির ন্যায় মানবজাতিও খনিবিশেষ। যারা জাহিলিয়্যাতের (অন্ধকারের) যুগে উত্তম ছিল, দীনের জ্ঞান লাভ করার কারণে তারা ইসলামের যুগেও উত্তম। (মুসলিম)

ইবনু মাস্'ঊদ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ দুই ব্যক্তি ছাড়া অন্য কারো ব্যাপারে হিংসা করা ঠিক নয়। প্রথম ব্যক্তি- যাকে আল্লাহ তা'আলা সম্পদ দান করেছেন, সাথে সাথে তা সত্যের পথে (ফী সাবীলিল্লাহ) বা সৎকার্যে ব্যয় করার জন্য তাকে তাওফীক্বও দিয়েছেন। দ্বিতীয় ব্যক্তি- যাকে আল্লাহ তা'আলা হিকমাহ্, অর্থাৎ- জ্ঞান ও প্রজ্ঞা দান করেছেন এবং সে এ জ্ঞান ও প্রজ্ঞা যথোপযুক্তভাবে কাজে লাগায় এবং (লোকদেরকে) তা শিখায়। (বুখারী ও মুসলিম)

আবূ হুরায়রাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ মানুষ যখন মারা যায় তখন তার 'আমল বন্ধ (নিঃশেষ) হয়ে যায়। কিন্তু তিনটি 'আমলের সাওয়াব (অব্যাহত থাকে): (১) সদাক্বায়ি জারিয়াহ্, (২) জ্ঞান- যা থেকে মানুষ উপকৃত হতে থাকে এবং (৩) সুসন্তান- যে তার (পিতা-মাতার) জন্য দু'আ করে। (মুসলিম)

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةِ أَشْيَاءَ: صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ أوعلم ينْتَفع بِهِ أوولد صَالح يَدْعُو لَهُ)

رَوَاهُ مُسلم

وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذا مات الانسان انقطع عمله الا من ثلاثة اشياء: صدقة جارية اوعلم ينتفع به اوولد صالح يدعو له) رواه مسلم

সহীহ : মুসলিম ।

অন্যান্য ধর্মে নারীর অধিকার ও অবস্থা

ইসলাম ধর্ম ব্যতীত অন্য সকল ধর্মেই নারীকে নিচু জাত বা ছোট করে দেখা হয় নারীকে কখনো পুরুষের সমতুল্য মনে করা হয় না একজন পুরুষকে যেরকম মান সম্মান মর্যাদা সামাজিক পারিবারিক ও আর্থিক মর্যাদা প্রদান করা হয় তা কখনোই একজন নারীকে প্রদান করা হয় না বরঞ্চ নারীদেরকে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করা হয় নারীদেরকে পুরুষদের ভোগ্যপণ্য মনে করা হয় এসব সম্পর্কে কিছু ধর্ম মতবাদ এবং কিছু সভ্যতায় নারীর অবস্থা নিয়ে আলোচনা করা হলোগবেষক ডাঃ গুস্তাগুলি বনের উক্তি বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেছেন: গ্রীকরা সচরাচর স্ত্রীলোকদের নীচ স্তরের মনে করতো। কোনো নারী অস্বাভাবিক সন্তান জন্ম দিলে তাকে হত্যা করা হতো। (-তামাদ্দুনে আরব')

স্পার্টায় যে হতভাগ্য নারীর গর্ভে কোনো জাতীয় সৈনিক জন্মানোর সম্ভাবনা না থাকতো, তাকে হত্যা করা হতো। কোনো স্ত্রীলোক সন্তান ধারণের উপযুক্ত হলে দেশের স্বার্থে ঐ স্ত্রীলোককে অন্য পুরুষ দ্বারা গর্ভধারণের জন্য তার স্বামীর নিকট থেকে ধার স্বরূপ নেয়া হতো। গ্রীকরা তাদের উন্নততর সভ্যতার যুগেও নর্তকী ছাড়া অন্য কোনো নারীর সম্মান করতো না।

'প্রাচীন কালের' বাগ্মী অধ্যায়ে লিখা আছে : "আল্লাহর নৈকট্য বা প্রিয় বান্দা মাত্রই নারীর সংস্পর্শ থেকে দূরে থাকবে। সহস্র শতাব্দীর মধ্যে আমি একজন মাত্র আল্লাহর প্রিয় পাত্র পেয়েছি। কিন্তু সমগ্র পৃথিবীতেও আল্লাহর একজন প্রিয়পাত্রী পাইনি।' -তামাদ্দুনে আরব রোমে "স্বামী তার স্ত্রীর উপর নিগ্রহমূলক শাসন ক্ষমতা চালাতো। সমাজে নারীর অধিকার বলতে কিছুই ছিলো না। স্বামী তার স্ত্রীর জানমালের নিরঙ্কুশ অধিকারী ছিলো। গ্রীসের অবস্থাও ছিলো হ-য-ব-র-ল।"ক্রাইসোসটাম একজন বিখ্যাত খৃষ্টীয় ধর্মগুরুরূপে সুপরিচিতি। তিনি নারী সম্বন্ধে বলেন, 'নারী একটি অনিবার্য পাপ, একটি জন্মগত কু-

প্ররোচনা, একটি আনন্দাদায়ক বিপদ, একটি পারিবারিক আশংকা, একটি ধ্বংসাত্মক প্রেমদায়িনী এবং একটি সঙ্কিত দুর্ঘটনা মাত্র।'

নারী সংক্রান্ত প্রবাদ

নারী জাতি সম্পর্কে বিভিন্ন দেশে যেসব প্রবাদসমূহ প্রচলিত আছে, তাতেও নারীদের মান-মর্যাদা সম্পর্কে তাদের চিন্তাধারা প্রকাশ পায়।

ইয়াহুদী আইন

তাওরাত ইস্তিছনা, পরিচ্ছেদ ২৫, নম্বর ৫-১০ এ উল্লেখ আছে, যদি দুই ভাই একত্র বাস করে এবং তাদের একজন অপুত্রক হয়ে মৃত্যুবরণ করে, তবে সেই মৃত ব্যক্তির স্ত্রী বাইরের অন্য গোষ্ঠীভূক্ত পুরুষকে বিবাহ করবে না। বরং তার দেবর তার কাছে গিয়ে তাকে বিয়ে করবে এবং তার প্রতি দেবরের কর্তব্য সাধন করবে। পরে সেই স্ত্রী যে প্রথম ছেলে সন্তান প্রসব করবে, সে ওই মৃত ভ্রাতার নামে উত্তরাধিকারী হবে। তাতে ইসরাঈলী হতে তার নাম লুপ্ত হবে না।

আর সেই পুরুষ যদি আপন ভ্রাতৃপত্নীকে গ্রহণ করতে অসম্মত হয়, তবে সেই ভ্রাতৃপত্নী

বিচারকদের সাক্ষাতে দেবরের নিকট এসে তার পদ হতে জুতা খুলবে এবং তার মুখে থুথু দেবে আর উত্তমভাবে বলবে, যে ব্যক্তি আপন ভাইয়ের জাত-কুল রক্ষা না করে, তার প্রতি এরূপই করা যাবে। আর ইসরাঈলের মধ্যে তার নাম হবে, “মুক্ত পাদুকার কুল'।" -ইসলাম কে সিয়াসী নীয়ে পবিত্র গ্রন্থে লিখা আছে 'নারী মৃত্যুর চেয়েও অধিক তিক্ত।' (-তামাদ্দুনে আরব)

হিন্দু শাস্ত্রের বিধান

হিন্দু শাস্ত্রের বিধানে নারী ও তার ইয্যত সম্মানের কি মূল্য ছিলো, সে সম্পর্কে প্রথমে স্বামী দয়ানন্দ সরস্বতীজী মহারাজ কৃত 'সতীর্থ প্রকাশ'- এর এই উদ্ধৃতিটির প্রতি লক্ষ্য করুন: "বিবাহ আট প্রকারেরঃ

ব্রহ্ম,

দৈব,

আর্য,

প্রজাপাত্য,

আসুর,

গান্ধর্ব,

রাক্ষস,

পৈশাচ।

এসব বিবাহের সংজ্ঞা ও ব্যাখ্যা নিম্নরূপ:

- বর-কনে পূর্ণ ব্রহ্মচারী, প্রাজ্ঞ ধার্মিক ও সচ্চরিত্র। তাদের পারস্পরিক সম্মতিতে যে বিবাহ অনুষ্ঠিত হয়, তাকে ব্রাহ্ম বিবাহ' বলে।
- বিরাট জাক-জমকপূর্ণ উত্তমরূপে যজ্ঞানুষ্ঠান সম্পন্ন করে জামাতাকে সালঙ্কারা কন্যা প্রদানকে দৈব বিবাহ' বলে।
- তিন, বর থেকে কিছু গ্রহণ করা হলে তা 'আর্য বিবাহ' বলে।
- স্বীয় ধর্মের উন্নতিকালে উভয়ের বিবাহ হলে 'প্রাজাপাত্য বিবাহ' বলে।
- বর কর্তৃক কনেকে পণ দিয়ে বিয়ে হলে 'আসুর বিবাহ' বলে।
- নির্জনে পাত্র-পাত্রী প্রেমালাপ করে স্বেচ্ছায় বিবাহ করার নাম 'গান্ধর্ব বিবাহ'।

- জোর করে কেড়ে নিয়ে অথবা ছলনার আশ্রয় দ্বারা যে বিবাহ করা হয়,তার নাম 'রাক্ষস বিবাহ' বলে।
- ঘুমন্ত কিংবা নেশা বা মদ প্রভৃতি পান করে অজ্ঞান বা উন্মাদ কনের শয্যা গ্রহণকে পিশাচ বিবাহ' বলে। (-সতীর্থ প্রকাশ, চতুর্থ অধ্যায়)

পরিবার কিংবা কয়েক ভাইয়ের মিলিত স্ত্রী প্রথা প্রাচীন ভারতবর্ষের এক সুপরিচিত পদ্ধতি। (-তামাদ্দুনে আরব)

মনুস্মৃতির নবম অধ্যায়ের ঊনষাট নম্বর শ্লোকের সারমর্ম হলো এই হিন্দু ব্রাহ্মণদের মধ্যে "নিয়োগ' প্রথা প্রচলিত আছে যে, স্বামীর দ্বারা সন্তান জন্ম না হলে স্ত্রী তার শ্বশুর প্রমুখের নির্দেশক্রমে কোনো নিকটাত্মীয় বা দেবর দ্বারা পছন্দ মত সন্তান উৎপাদন করাতে পারে। (-ইসলাম কে মাআশী নযরীয়ে)

সতীর্থ প্রকাশ গ্রন্থে আছে:

স্ত্রী 'বন্ধ্যা হলে অষ্টম বছর (বিয়ের পর থেকে আট বছর পর্যন্ত স্ত্রী গর্ভবতী না হলে) সন্তান জন্মের পর মারা গেলে দশম বছর পর্যন্ত পুত্র সন্তান না হয়ে বার বার কন্যা সন্তান হলে একাদশ বছর স্ত্রী

অপ্রিয়ভাষিণী হলে সত্বর উক্ত স্ত্রীকে পরিত্যাগ করে অপর স্ত্রীলোকের সাথে নিয়োগ' করে সন্তান উৎপাদন করবে।' (-সতীর্থ প্রকাশ, চতুর্থ পরিচ্ছেদ।)

তেমনি ভাবে স্বামী চরম উৎপীড়ক হলে স্ত্রীর উচিত তাকে পরিত্যাগ করে অন্য লোক 'নিয়োগ' করে সন্তান উৎপাদন করানো এবং উৎপাদিত সন্তানকে উক্ত বিবাহিত স্বামীর উত্তরাধিকারী বানাবে। (-সতীর্থ প্রকাশ)

স্বামী সন্তান জন্মদানে অক্ষম হলে স্বীয় স্ত্রীকে এই মর্মে অনুমতি দেবে যে, 'হে সৌভাগ্যবর্তী সন্তান অভিলাষিণী। তুমি আমাকে ছেড়ে অন্য স্বামী গ্রহণ করো, কেননা এখন আমার দ্বারা সন্তান উৎপাদন হবে না। তখন স্ত্রী অন্য লোক 'নিয়োগ' করে সন্তান উৎপাদন করাবে। কিন্তু উক্ত বিবাহিত উষ্চমনা স্বামীর সেবায় সদা সর্বদা প্রস্তুত থাকবে। তেমনিভাবে স্ত্রীও রোগ প্রভৃতি কারণে সন্তান ধারণে অক্ষমা হলে স্বীয় স্বামীকে অনুমতি দেবে....অপর কোনো বিধবা স্ত্রীর সাথে 'নিয়োগ' করে সন্তান উৎপাদন করুন। (-সতীর্থ প্রকাশ)

"নিয়োগ' প্রথার আরো বিশ প্রকারের অবস্থা উক্ত গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে। এ- তো ছিলো বিয়ে-শাদীর অবস্থা। এখন নারীর রূপ-প্রকৃতি সম্পর্কেও একটু শুনুনঃ

“হিন্দু শাস্ত্র বলেঃ মৃত্যু, নিরয়, হলাহল, নিয়তি, ঝঞ্ঝা, আশীবিশ এগুলোর কোনোটিই ততোটা খারাপ (অলক্ষণে) নয়, যতোটা খারাপ নারী। (-তামাদ্দুনে আরব)

মনুর বিধান বলেঃ "নারী শিশু কালে পিতার অধীন, পূর্ণ বয়সে স্বামীর অধীন, স্বামীর পর স্বীয় পুত্রদের, পুত্র না থাকলে আত্মীয়-স্বজনের। কেননা কোনো নারীই স্বাধীনভাবে জীবন যাপনের উপযুক্ত নয়।” (-তামাদ্দুনে আরব)

ইসলাম নারীর নিরাপত্তা দাতা

আল্লাহ তায়ালা নারীদের জন্য যে সব বিধান দিয়েছে, তা সবই নারীদের নিরাপত্তা ও তাদের মান সম্মানের হেফাজত করার জন্যই দিয়েছেন। সুতরাং এ কথা বলা বাহুল্য যে আল্লাহ তাআলার নিয়ামত অনুগ্রহ নারীদের ওপর অসংখ্য ও অনেক বেশি। ফলে ইসলামের মধ্যেই তাদের জন্য নিহিত রয়েছে তাদের কল্যাণ একমাত্র ইসলামই নিশ্চিত করেছে তাদের নিরাপত্তা এবং তাদেরকে দিয়েছে তাদের মান মর্যাদা রক্ষা করার অধিকার ।ইসলাম নারীদের থেকে যাবতীয় ফিতনা-ফাসাদ দূর করেছে ,যাতে তারা দুনিয়াতে পাক পবিত্র জীবন যাপন করতে পারে এবং তারা যাতে কোন প্রকার ধ্বংস বিপদ ও নিরাপত্তাহীনতায় না ভোগে। ইসলাম তাদের রক্ষা করে সব ধরনের ভ্রান্তি বিকৃতি ও ভ্রষ্টতা হতে ।ইসলাম একজন মুসলিম নারীকে সর্বাধিক সম্মানে ভূষিত করেছে সর্বোত্তম নিরাপত্তা দিয়েছে এবং ইসলাম তার জন্য পাক পবিত্র জীবনের দায়িত্ব নিয়েছে। এ সকল বিষয়ের নিদর্শন হলো পবিত্রতার আলামত , পরিশুদ্ধতা আর ঝান্ডা হল উত্তম চরিত্র ও উন্নত সংস্কৃতি। একজন নারী যতক্ষণ পর্যন্ত দ্বীন ইসলামকে আকড়ে ধরে রাখবে আল্লাহর দেওয়া বিধান মেনে চলবে নবীর অনুকরণ করবে সে আত্মমর্যাদাশীল উন্নত চরিত্রের অধিকারী ও উত্তম জাতি হিসেবেই পরিগণিত হবে। এতে সে দুনিয়াতে সফলতা ও প্রশান্তি লাভ করবে আর কিয়ামতের দিন মহান সওয়াব ও বিনিময়ের অধিকারী হবে ।ইমাম আহমদ আব্দুল রহমান বর্ণনা করেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন-

"নারীরা যখন পাঁচ ওয়াক্ত সালাত আদায় করবে রমজানের তাওম রাখবে লজ্জা স্থানের সংরক্ষণ করবে এবং স্বামীর অনুকরণ করবে জান্নাতে যে কোন দরজা দিয়ে সে প্রবেশ করতে পারবে" হাদিসে নারীদের জন্য জান্নাতের পথকে কতই না সহজ করা হয়েছে।

একজন নারী যখন উল্লেখিত দিকনির্দেশনা অনুযায়ী জীবনযাপন করবে তখন তার জন্য জান্নাতে সব দরজা গুলো খুলে দেওয়া হবে।

وَ اللّٰهُ يُرِيْدُ اَنْ يَّتُوْبَ عَلَيْكُمْ ۫ وَ يُرِيْدُ الَّذِيْنَ يَتَّبِعُوْنَ الشَّهَوٰتِ اَنْ تَمِيْلُوْا مَيْلًا عَظِيْمًا ﴿۲۷﴾

আল্লাহ তোমাদের তওবা কবুল করতে চান। আর যারা প্রবৃত্তির অনুসারী তারা চায় যে, তোমরা ভীষণভাবে পথচ্যুত হও।

(সূরা আন নিসা আয়াত ২৭)

আল্লাহর ক্ষমাশীলতা: এই আয়াতের প্রথম অংশে বলা হয়েছে যে আল্লাহ তাআলা তাঁর বান্দাদের প্রতি ক্ষমাশীল হতে চান। অর্থাৎ, তিনি চান মানুষ যখন পাপ করে অনুতপ্ত হবে, তখন যেন তারা তাওবা করে, এবং আল্লাহ তাদের তাওবা কবুল করবেন।

কুপ্রবৃত্তির অনুসারীদের চক্রান্ত: অন্যদিকে, যারা কুপ্রবৃত্তির অনুসরণ করে, তারা চায় মানুষ যেন সঠিক পথ থেকে বিচ্যুত হয়ে পাপ ও অন্যায়ের দিকে ধাবিত হয়। তারা চায় মানুষ যেন আল্লাহর নির্দেশনা উপেক্ষা করে নিজেদের ক্ষণস্থায়ী আকাঙ্ক্ষার পিছনে ছুটে বেড়ায়।

সঠিক পথ ও বিপথে যাওয়ার মধ্যে পার্থক্য: এই আয়াতটি মূলত তাওবা এবং পাপাচার এর মধ্যে একটি স্পষ্ট পার্থক্য তুলে ধরে। আল্লাহ তাওবার পথকে সহজ করতে চান, কিন্তু শয়তান ও তার অনুসারীরা মানুষকে বিপথে চালিত করার চেষ্টা করে।

আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের ব্যাখ্যা: এই আয়াতটি 'ইন্না-ল্লাযীনা ইয়াতাবউ'নাল-শাওয়াত'-এর উপর জোর দেয়, যা কুপ্রবৃত্তির অনুসারীদের কথা বলছে। তাদের লক্ষ্য হলো মানুষকে ভুল পথে চালিত করা। এই আয়াতটি এই ধরনের প্রবণতার বিরুদ্ধে সতর্ক করে এবং আল্লাহ ও তার রাসুলের দেখানো পথে থাকার জন্য উৎসাহিত করে।

বর্তমান যুগে নারীরা প্রতি নিয়ত ষড়যন্ত্রের শিকার হচ্ছে ।এই ষড়যন্ত্র পশ্চিমাদিষ্ট এবং ইহুদি নাসারা করে চলেছে তারা ইসলাম বিরোধী কর্মকাণ্ডের জন্য নারীদেরকে প্রলোভন দেখাচ্ছে এবং ইসলামকে তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করে ।তারা সবসময় বলে ইসলাম নারীকে ঘরে আটকে রেখেছে, ইসলাম নারীর অধিকার ক্ষুন্ন করেছে, তারা সাধারণত নারীর অধিকার বলতে বোঝায় বেপর্দা বেপরোয়া ভাবে নারীর অবাক চলাফেরা। নারীকে তার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ প্রদর্শন এর মাধ্যমে উপস্থাপন করা। তাদের ষড়যন্ত্রের জাল হিসেবে ব্যবহার করেছে প্রগতিবাদ নারী স্বাধীনতা ,সমান অধিকার ইত্যাদি মিথ্যা স্লোগান ।নারীদের ইজ্জত, সম্মান, আত্ম মর্যাদা, পবিত্রতা ধ্বংসের নিমিত্তে তারা ইসলাম ও মুসলিমদের বিরুদ্ধে নানা প্রকার অপপ্রচার চালাচ্ছে। তারা আজ পর্দার সম্পূর্ণ বিপক্ষে অবস্থান নিচ্ছে। পর্দা কে তারা সেকেলে বলে আখ্যায়িত করে ।নারীদেরকে ঘর থেকে বের করে রাস্তায় নামিয়ে নারী ও পুরুষের অবাধ মেলামেশাকে উৎসাহ দিয়ে যাচ্ছে ।বিভিন্ন প্রচার মাধ্যম পেপার পত্রিকা বাদ্যযন্ত্র ইত্যাদিতে নারীদের বিভিন্ন ধরনের উলঙ্গ ও নোংরা ছবি প্রদর্শন করার মাধ্যমে আজ তাদের কলঙ্কিত করেই চলেছে ।এসব দেখে মুসলিম নারীরাও আজ ঘরে থাকতে চাই না। তারা আজ ইহুদি ,নাসারা, খ্রিস্টান ও পশ্চিমা বিশ্বকে অনুকরণ করতে শুরু করেছে ।পর্দা কে তারা আজ তাদের উন্নতির পথে বাধা স্বরূপ হিসেবে দেখে ।এবং আল্লাহর দেয়া বিধানকে তারা তাদের জন্য জেলখানার শিকল হিসেবে মনে করছে ।এই সমস্ত কিছুই মূলত একদিনের ব্যাপার নয় এইগুলোকে প্রতিষ্ঠা করার লক্ষ্যে পশ্চিমারা এবং ইহুদী-নাছারারা পরিকল্পিতভাবে তাদের কর্মকান্ড পরিচালনা করে যাচ্ছে।

তারা অল্প অল্প করে নারী স্বাধীনতা ,নারী স্বাধীনতা, বলে নারীর সহ শিক্ষার অধিকার ,সমান অধিকার এই কথাগুলো বলে নারীকে ঘর থেকে বের হয়ে আসতে উৎসাহ প্রদান করছে, আজকাল অনেক মুসলিম নারী সহশিক্ষায় জড়িয়ে পড়ছে। ফলে প্রতি নিয়ত ফিতনা-ফ্যাসাদ এর সৃষ্টি হচ্ছে। সমাজ অপকর্ম জিনা -ব্যভিচার ইত্যাদিতে প্রতিনিয়তই আক্রান্ত হচ্ছে । যদি একজন নারী প্রকৃতপক্ষে ইসলামের সম্পূর্ণ রীতি-নীতি পালন করে তার জীবনকে সেই আলোকে সজ্জিত করে তবে একজন নারীর জীবনে প্রকৃত সুখের

ছোঁয়া দেখা মেলে ।ইসলাম ব্যতীত কখনোই একজন নারীর প্রকৃত সুখ অর্জন করতে পারে না। ইসলাম একজন নারীকে কি দেয়নি কি থেকে নারীকে বঞ্চিত করেছে? ইসলাম নারীকে দিয়েছে তার পূর্ণাঙ্গ সম্মান পূর্ণাঙ্গ মর্যাদা ,শিক্ষার অধিকার কন্যা হিসেবে অধিকার ,স্বামীর অধিকার, বিবাহের অধিকার ,উপার্জনের অধিকার ।কোন জিনিস হতে ইসলাম নারীকে বাধা দেয়নি একজন নারীর প্রকৃত সুখ স্বাচ্ছন্দ লুকিয়ে আছে ইসলামের নিবিড় ছায়া তলে।

জান্নাতের সুসংবাদ প্রাপ্ত নারিদের অবস্থান

যুগে যুগে ইসলাম এসে ফিরিয়ে দিয়েছে নারীদের অধিকার। অশিক্ষা আর কুসংস্কারের নর্দমা থেকে উন্নীত করেছে এক মহোত্তম জাতিতে। যখন নারী জাতি ছিল জুলুম-নিপীড়নে পিষ্ট, অধিকার বঞ্চিত, কেবলই ভোগ্যপণ্য তখন প্রিয় নবী হজরত মুহাম্মাদ (সা.) ঘোষণা করেছিলেন নারীজাতির মুক্তির ইশতেহার। প্রতিষ্ঠা করেছিলেন নারীর শিক্ষাগত, পরিবারিক ও সামাজিক অধিকার।

আর এই নারীদের মধ্য থেকে চারজন জান্নাতি নারীকে রাসূলুল্লাহ (সা.) সর্বশ্রেষ্ঠ বলে ঘোষণা করেছেন। হাদিসে এসেছে, 'জান্নাতি নারীদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ নারীরা হলেন

১. খাদিজা বিনতু খুয়াইলিদ,

২. ফাতিমা বিনতু মুহাম্মাদ,

৩. ফিরাউনের স্ত্রী আসিয়া বিনতু মুযাহিম এবং

৪. মারইয়াম ইবনাতু ইমরান।' (আহমাদ, আলমুসনাদ)

১. খাদিজা বিনতু খুয়াইলিদ

আবরাহা কর্তৃক কাবা আক্রমণের পনেরো বছর আগে মক্কার সম্ভ্রান্ত কুরাইশ বংশে জন্মগ্রহণ করেন খাদিজা বিনতু খুয়াইলিদ। তার পিতা ছিলেন ফিজার যুদ্ধের সেনাপতি খুয়াইলিদ ইবনু আসাদ। খাদিজা (রা.) ছিলেন আরবের প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী। ব্যবসার কাজে বিশ্বস্ত লোক প্রয়োজন ছিল তার। এ দিকে মুহম্মাদ (সা.) সত্যবাদিতা ও বিশ্বস্ততার জন্য পুরা আরবে প্রবাদতুল্য হয়ে উঠেছিলেন। খাদিজা (রা.) তাকে তার ব্যবসার পুরো

দায়িত্ব বুঝিয়ে দিলেন। নবীজির চারিত্রিক মাধুর্যতায় মুগ্ধ হয়ে এক পর্যায়ে খাদিজা নিজেই বিয়ের প্রস্তাব দেন নবিজিকে।

৫০০ স্বর্ণমুদ্রা মোহরানার বিনিময়ে বিয়ে সম্পন্ন হয়। তখন নবীজির বয়স ছিল ২৫, আর খাদিজার ৪০ বছর। চল্লিশ বছর বয়সে মুহাম্মাদ (সা.) নবুয়ত লাভ করেন। প্রথম ওহি লাভের পর তিনি এতটাই ভীত হয়ে পড়েন যে, কাঁপতে কাঁপতে নিজ ঘরে প্রবেশ করে খাদিজাকে বলেন কম্বল দিয়ে গা ঢেকে দিতে। বারবার বলতে থাকেন, 'আমাকে আবৃত করো, আমাকে আবৃত করো।' পুরো ঘটনা শুনে খাদিজা (রা.) নবীজির সকল কথা বিশ্বাস করেন এবং তাঁকে নবী হিসেবে মেনে নেন। ভীতি দূর করার জন্য মুহাম্মাদকে নিয়ে খাদিজা নিজ চাচাতো ভাই ওয়ারাকা ইবনু নওফেলের কাছে যান। নওফেল তাঁকে শেষ নবী হিসেবে আখ্যায়িত করেন। খাদিজা ইসলাম গ্রহণ করেন। তিনিই ছিলেন প্রথম ইসলাম গ্রহণকারী।

নবীজির দাওয়াতি কাজে সবচেয়ে বেশি সহযোগিতা করেছিলেন খাদিজা (রা.)। তার সমস্ত সম্পদ ধীরে ধীরে ব্যয় করে দেন এ কাজে। এমনকি এক পর্যায়ে প্রটÐ অর্থকষ্ট শুরু হয়। নবুওয়তের সপ্তম বছর মক্কার কুরাইশরা মুসলিমদের বয়কট করে। তারা সবাই মিলে 'শিয়াবে আবু তালিব' নামক স্থানে আশ্রয় গ্রহণ করে। অন্যান্য মুসলিমদের সঙ্গে খাদিজাও সেখানে ছিলেন। প্রায় ৩ বছর মুসলিমদের সেই দুর্গম স্থানে নির্বাসিত কাটাতে হয়েছিল। তখন গাছের পাতা খেয়েও দিন কাটাতে হয়েছে তাদের। খাদিজা তখন কুরাইশদের ওপর নিজের প্রভাব খাটিয়ে খাদ্যের ব্যবস্থা করে দিতেন মুসলিমদের। এভাবে তার সমস্ত সম্পদ দিয়ে, মানসিকভাবে এবং শারিরিকভাবেও প্রচন্ড কষ্ট সহ্য করে দীনের জন্য সারা জীবন কাজ করে গেছেন তিনি।

৬১৭ খ্রিস্টাব্দ মুতাবেক রমজান মাসের ১০ তারিখে ৬৫ বছর বয়সে ইন্তেকাল করেন মুমিনজননী খাদিজা রাদিয়াল্লাহু আনহা। মক্কার জান্নাতুল মুয়াল্লায় তার কবর অবস্থিত।

২. ফাতিমা বিনতু মুহাম্মাদ

ফাতিমা (রা.) ছিলেন নবীজির প্রিয়তম কন্যা। তার মা ছিলেন খাদিজা (রা.)। ৬০৫ খ্রিস্টাব্দে মক্কায় জন্মগ্রহণ করেন তিনি। মক্কায় সেই নাজুক দিনগুলোতে ছায়া হয়ে ছিলেন পিতার পাশে। হিজরতের সময় ফাতিমাও নবিপরিবারের অন্যদের সঙ্গে হিজরত করেন। তিনি ছিলেন চতুর্থ খলিফা মহান বীর আলি ইবনু আবু তালিবের স্ত্রী এবং সাইয়িদুনা হাসান ও হুসাইনের মা। তার বদান্যতা, মহানুভবতা আর মমতা ছিল প্রবাদতুল্য। প্রিয় বাবা দয়ার নবীর চরিত্রের প্রতিটি গুণই তার জীবনে প্রতিফলিত হতে দেখা গেছে। তিনি ছিলেন আমানতদারী, লাজুক, নম্র ও সরলমনা। ছিলেন নির্ভীক ও তেজস্বিনী। নবিজির ওফাতের মাস কয়েক পরেই তিনি মৃত্যুবরণ করেন এবং মদিনার বাকিতে তাকে দাফন করা হয়।

৩. আসিয়া বিনতু মুযাহিম

আসিয়া বিনতু মুযাহিম ছিলেন জঘন্য আল্লাহদ্রোহী শাসক ফেরাউনের স্ত্রী। আসিয়ার কোলেই লালিত-পালিত হয়েছিলেন নবী মুসা আলাইহিস সালাম।

ফিরাউনের রাজপ্রাসাদের যাবতীয় আরাম-আয়েশকে বিসর্জন দিয়ে আসিয়া গ্রহণ করে নিয়েছিলেন তাওহিদকে। ঈমান এনেছিলেন আল্লাহর ওপর। এতে ফিরাউন তার ওপর ভীষণ ক্ষিপ্ত হয়। আসিয়ার ওপর নেমে আসে জুলুম-নির্যাতন। তাকে জিঞ্জিরে বেঁধে রাখা হয়, বিশাল পাথরের নিচে চাপা দিয়ে রাখা হয়। পাথরের আঘাতে তার দেহ ক্ষতবিক্ষত হয়।

কিন্তু এতসব অমানবিক নির্যাতনেও আসিয়াকে চুল পরিমাণ টলানো সম্ভব হয়নি তার ঈমান থেকে।

৪. মারইয়াম ইবনাতু ইমরান

মারইয়াম ইবনাতু ইমরান ছিলেন বাইতুল মুকাদ্দাসের নাসিরা শহরের বাসিন্দা। পিতা-মাতার ইচ্ছানুযায়ী বাইতুল মুকাদ্দাসের খেদমতে নিযুক্ত হয়েছিলেন তিনি। তার পিতার নাম ছিল ইমরান এবং নবী যাকারিয়ার শ্যালিকা বিবি হান্না ছিলেন তার মা।

মারইয়াম ছিলেন চিরকুমারী। কিন্তু আল্লাহর আদেশে তিনি গর্ভে ধারণ করেছিলেন নবী ঈসা আলাইহিস সালামকে। বাইতুল মুকাদ্দাস থেকে বের করে দেয়া হয় তাকে। এমনকি স্বগ্রামও ছেড়ে যেতে হয়। বিপদাপন্ন মারইয়াম কোনো আশ্রয় খুঁজে না পেয়ে একটি পতিত জমিনে এক খেজুর গাছের নিচে আশ্রয় নিলেন এবং নবী ঈসাকে প্রসব করলেন। পাক-পবিত্র হয়ে সন্তান নিয়ে আবারো বাইতুল মুকাদ্দাসে ফিরে গেলেন। কোলের শিশু তার মায়ের নিষ্কলুষতার ঘোষণা দিল। আর ভবিষ্যতে তার নবী হওয়ার ব্যাপারেও জানিয়ে দিল। মারইয়াম আলাইহাস সালাম তাকে গড়ে তুললেন জ্ঞান, প্রজ্ঞা আর দক্ষতার শিক্ষা দিয়ে। ত্রিশ বছর বয়সে ঈসা আলাইহিস সালাম আল্লাহর কাছ থেকে ওহি লাভ করেন এবং ইসলাম প্রচার শুরু করেন।

ইসলামে বিধবা ও তালাকপ্রাপ্ত নারীর অধিকার ও অবস্থান

ইসলামপূর্ব জাহেলি সমাজে বিধবা ও তালাকপ্রাপ্ত নারীরা বিভিন্ন অবিচার ও বৈষম্যের শিকার ছিল। কিন্তু ইসলাম স্বামীহারা নারীদের মানবিক সম্মান ও অধিকার দিয়েছে। মহানবী (সা.) বিধবা নারীদের সামাজিক ও ধর্মীয় সম্মান প্রতিষ্ঠা করেছেন।আমাদের সমাজে বিধবা ও স্বামীহারা নারীরা শুধু পরিবারে অবহেলিত নয়; বরং অনেকে তাদের অপয়া মনে করে। অথচ তারা কখনো অপয়া, অচ্ছুৎ ও অস্পৃশ্য নয়।বিধবা নারীকে সম্মানজনক জীবনযাপনের জন্য প্রয়োজনীয় সব অধিকার দিয়েছে ইসলাম।তালাকপ্রাপ্তা বা বিধবা নারীর ভরণ-পোষণ ও তত্ত্বাবধানের প্রধান দায়িত্ব তার সন্তানদের। অতঃপর তার ভাইদের। অতঃপর সর্বাধিক নিকটবর্তী আত্মীয়গণ।

রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন, ‘তোমাদের সন্তানগণ তোমাদের পবিত্রতম উপার্জনের অন্তর্ভুক্ত। অতএব তোমরা তোমাদের সন্তানদের উপার্জন থেকে ভক্ষণ কর’ (আবুদাঊদ হা/৩৫৩০, মিশকাত হা/৩৩৫৪)।

এছাড়া নিকটতম রক্তসম্পর্কীয়দের মধ্যে ভাইয়ের গুরুত্ব সর্বাধিক।

জাবের (রাঃ) তার ছোট বোনদের দেখাশুনার জন্য একজন তালাকপ্রাপ্তা মহিলাকে বিবাহ করলে রাসূল (ছাঃ) তার প্রশংসা করেন (বুখারী হা/৬৩৮৭; মুসলিম হা/৭০১৫; মিশকাত হা/৩০৮৮)।

রাসূল (সা.) বলেন, যার তিনটি মেয়ে বা তিনটি বোন থাকে অথবা দু’টি মেয়ে বা দু’টি বোন থাকে। আর সে যদি তাদের সাথে সব সময় সদাচরণ করে এবং তাদের বিষয়ে আল্লাহকে ভয় করে, তবে তার জন্য রয়েছে জান্নাত (আহমাদ হা/১২৬১৫; ছহীহাহ হা/২৯৫)।

রাসূল (সা.) বোনের মানত ভাই পূরণ করবে মর্মে নির্দেশনা দিয়েছেন (নাসাঈ হা/২৬৩২; আহমাদ হা/২১৪০)। তবে ভাই বা রক্তসম্পর্কিত নিকটাত্মীয় না থাকলে সমাজ বা সরকার তাদের দায়িত্ব বহন করবে।

রাসূল (সা.) বলেন, যদি তারা ঝগড়া করে, তাহ'লে সরকার ঐ ব্যক্তির অভিভাবক হবে, যার কোন অভিভাবক নেই' (আবুদাঊদ হা/২০৮৩; মিশকাত হা/৩১৩১)।

মহানবী (সা.) একাধিক বিধবা নারীকে বিয়ে করে তাদের প্রতি সামাজিক অবজ্ঞার পথ বন্ধ করে দিয়েছেন। একইসঙ্গে তিনি বিধবার প্রতি সদয় আচরণ করতে উদ্বুদ্ধ করেছেন। হজরত আবু হুরায়রা (রা.) বলেন, নবী (সা.) বলেছেন, 'বিধবা ও মিসকিনের জন্য খাদ্য জোগাড়ে চেষ্টারত ব্যক্তি আল্লাহর রাস্তায় জিহাদকারীর মতো অথবা রাতে সালাতে দণ্ডায়মান ও দিনে সিয়ামকারীর মতো।' (সহিহ বুখারি: ৫৩৫৩)

অন্য হাদিসে এসেছে, 'রাসুলুল্লাহ (সা.) কোনো বিধবা ও অভাবীর সঙ্গে পথ চললে তাদের প্রয়োজন পূরণ করতেন।' (সুনানে নাসায়ি: ১৪২৫)

ইসলাম বিধবা নারীকে শুধু বিয়ের অনুমতি দেয়নি; বরং উৎসাহিত করেছে। নির্ধারিত সময় ইদ্দত পালন করার পর বিধবা নিজের পছন্দ অনুযায়ী যেকোনো পুরুষকে বিয়ে করতে পারবে। তাকে বাধা দেয়ার অধিকার কারো নেই।

সাধারণত সন্তানের মুখের দিকে তাকিয়ে বিধবা নারী তার জীবন ও যৌবন বিসর্জন দেয় অথবা সন্তানের দোহাই দিয়ে তাকে দ্বিতীয় বিয়ে থেকে বিরত রাখা হয়। ইসলাম বিধবা নারীকে সন্তানের 'একক দায়' থেকে মুক্তি দিয়েছে। ইসলামি শরিয়তমতে, সম্পদ ও ব্যয় নির্বাহের ক্ষেত্রে পিতার অবর্তমানে দাদা সন্তানের অভিভাবক এবং তার অবর্তমানে ইসলামি রাষ্ট্রের বিচারক অভিভাবক নির্ধারণ করে দেবে। অবশ্য মা সন্তান প্রতিপালন করবে যতক্ষণ না সে অন্যত্র বিয়ে করে। রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেন, 'তুমি সন্তানের ব্যাপারে বেশি হকদার যতক্ষণ না তুমি বিয়ে করো।' (আবু দাউদ: ২২৭৬)

তালাকপ্রাপ্ত নারীকে বিয়ে করার প্রধান ফজিলত হলো, এটি একটি সওয়াবের কাজ, বিশেষ করে যদি তিনি অসহায় হন। এতে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করা যায় এবং

সামাজিক দায়িত্ব পালন হয়, যা অনেক সাহাবায়ে কেরাম পালন করেছেন। এই ধরনের বিয়ে সমাজে ইতিবাচক প্রভাব ফেলে এবং যারা এই কাজে এগিয়ে আসেন, তাদের অনেক সওয়াব পাওয়ার আশা করা যায়। এটি একটি অত্যন্ত সওয়াবের কাজ, যা আল্লাহকে খুশি করতে সাহায্য করে।তালাকপ্রাপ্ত বা বিধবা নারীদের দায়িত্ব নেওয়া সমাজের প্রতি একটি গুরুত্বপূর্ণ অবদান, যা অনেক সাহাবায়ে কেরামও করেছেন।যারা তালাকপ্রাপ্তা নারীকে বিয়ে করেন, তারা অন্যান্যদের জন্য একটি ইতিবাচক দৃষ্টান্ত স্থাপন করেন, যা সমাজকে উৎসাহিত করে।যারা এই ধরনের বিয়ে করেন, তাদের জীবনে শান্তি ও সন্তুষ্টি আসে।

মুসলিম নারীর সর্তকতা

বর্তমান সময়ে জাহিলিয়াত যুগের মত আবার নারীকে ঘর থেকে টেনে হিঁচড়ে বের করার সুপরিকল্পনা প্রতিনিয়তই চলছে ।আর এই ফাঁদে পা দিচ্ছেন অগণিত অসংখ্য মুসলিম বোনেরা। আজ ইসলামকে তোয়াক্কা না করে আল্লাহ তাআলার বিধি-নিষেধকে তোয়াক্কা না করে শুধু দুনিয়াবী লোভ-লালসা ও পার্থিব কিছু তুচ্ছ বিষয়কে গুরুত্বের সাথে দেখা হচ্ছে ।মূলত এই দেখানোর পেছনে কাজ করে চলেছে অসংখ্য এজেন্ডা, যাদের মূল উদ্দেশ্য হলো নারীকে আবার পণ্য হিসাবে বের করে নিয়ে আসা। সমাজে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করা ফিতনা-ফাসাদ সৃষ্টি করা ।এর ফলে প্রতিদিন শত শত সংসার ভাঙছে। নিজের ক্যারিয়ার গড়তে গিয়ে মায়েরা তাদের সন্তানকে মায়ের মমতা স্নেহ থেকে বঞ্চিত করছে। সহকর্ম সহশিক্ষা ইত্যাদি নিয়ে ব্যতিব্যস্ত হচ্ছে ।সমাজকে শেখানো হচ্ছে নারীর চাকরি ,পুরুষের সাথে মেলামেশা একই পরিবেশে একই সাথে পড়াশোনা করা, এগুলো আজ আধুনিকতা ।কিন্তু এই আধুনিকতার ভেতরে ন্যূনতম সুখের কোন ছায়া নেই। আছে শুধু দুনিয়াকে আঁকড়ে ধরে রাখা। নেই কোন আত্মীয়তার বন্ধন ,নেই নিজের সন্তানের দেখভাল করার মত সময়, ভালোবাসা। আজ নিজের ক্যারিয়ার গড়তে যে হাজার হাজার বোনেরা ছুটে চলেছে রাস্তায়, এই ক্যারিয়ারকে সাজাতে যেয়ে আবার অনেকে পাড়ি দিচ্ছে পশ্চিমা বিশ্বে। তারা পশ্চিমাদেরকে উন্নত জাতি হিসেবে মেনে নিয়েছে ।ফলে নিজেরাও সেখানে গিয়ে ইসলামকে ভুলে যাচ্ছে ।ইসলামের বিরোধিতা করছে এবং আল্লাহ তায়ালার দেয়া বিধানকে ভুলে গিয়ে পাশ্চাত্যের সংস্কৃতি আঁকড়ে ধরছে। উন্নত জীবনযাত্রা এবং খোলামেলা পোশাক পড়তে চাচ্ছে ।আজকে ষড়যন্ত্রকারীরা নারীদের কোমলতা ,সরলতা ও জ্ঞান বুদ্ধির দুর্বলতা কে পুঁজি করে তাদের ঘর থেকে বের করে আনছে ।তাদের রাস্তায় নামিয়ে দেয়া হচ্ছে এবং তাদের ক্ষমতার বাহিরে কিছু দায়িত্ব তাদের উপরে চাপিয়ে দেওয়া হচ্ছে। তাদের এমন বিপর্যয়ের দিকে টেনে আনা হচ্ছে যার ভয়াবহতা, করুন পরিণতি ও ক্ষতি সম্পর্কে তারা আদৌ অবগত নয়।

বর্তমানে অমুসলিম রাষ্ট্রীয় নারীরা অত্যন্ত নির্মম অমানবিক ও অসহায় অবস্থায় জীবন যাপন করছে বর্তমানে এক শ্রেণীর লোক আছে যাদের চিন্তা চেতনা পশ্চিমাদের চিন্তা চেতনারই ধারক বাহক এবং তাদের সভ্যতা সংস্কৃতির অন্ধ অনুসারী। আমাদের দেশের নারীরা তাদের নিজ বৈশিষ্ট্যে লজ্জাবতী ও নিরাপদে থাকে ,তার ওপর সন্তুষ্ট নয়। তারা চায় আমাদের দেশের নারীরাও যেন পশ্চিমা দের মত বের হয়ে আসে এবং ইসলাম যেগুলোকে সমর্থন করে না সেই কাজগুলো করে ।অর্থাৎ পশ্চিমা ও ধর্মহীন দেশের নারীদের মতো রাস্তায় বের হবে বেপর্দা হয়ে ঘুরে বেড়াক এবং পুরুষদের সাথে অবাধে চলাফেরা করুক ।ফলে তারা বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় নারীদের নিয়ে অশালীন লেখালেখি ও ছবি উপস্থাপন করে। এসে সকল লেখালেখি এবং ছবি উপস্থাপনের উদ্দেশ্য হলো দেখার পরে নারীদের প্রতিক্রিয়া কিরূপ ।নারীদের নামে তারা বিভিন্ন ধরনের দাবিদাওয়া উপস্থাপন করে ।তারা মূলত পদ্মার বিরোধিতা করে। আল্লাহ নারীদের পর্দা করার যে নির্দেশ দিয়েছে তারা তার বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়েছে। পর্দা যা নারীদের সম্ভ্রম ও ইজ্জতের প্রতীক তার বিরুদ্ধে তারা নানা প্রকাশ স্লোগান চালাচ্ছে ।আজকাল নারীদের ছবি তোলাও একটা নিত্য নৈমিত্তিক বিষয় হয়ে গিয়েছে। ছবি তুলে বিভিন্ন সামাজিক মাধ্যমে নিজেকে প্রদর্শন করা, বিভিন্ন অঙ্গভঙ্গি ও শারীরিক লাল-সাময়ী চিত্র প্রদর্শন করে নিজের সৌন্দর্যকে চারিদিকে ছড়িয়ে দেয়ার কাজে মেতে আছে অনেক নারী ।বর্তমান যুগে এটি খুব বেশি ঘটছে ।প্রতিনিয়ত নারীরা তাদের ছবি বিভিন্ন সামাজিক মাধ্যমে আপলোড করছে এবং এর মাধ্যমে নিজেকে প্রদর্শন করে বেড়াচ্ছে। যখন পুরো সমাজেই একটি বড় অংশ এরূপ কাজে লিপ্ত রয়েছে সমাজের অন্যান্য নারীরাও এদেরকে দেখে অনুপ্রাণিত হচ্ছে । ফলে দিন দিন এর মাত্রা বেড়েই যাচ্ছে। শয়তান মানুষের প্রকাশ্যে ও প্রকাশ্যে শত্রু শয়তান বিভিন্ন ফাঁদেই আমাদেরকে প্রতিনিয়তই ফেলে কিন্তু এই ফাঁদ থেকে বেরিয়ে এসে ইসলামের রীতিনীতি কে আঁকড়ে ধরে বেঁচে থাকাই হল দুনিয়া এবং আখেরাতের সাফল্য। রাসূল সাল্লাল্লাহু ওয়া সাল্লাম যেখানে নারীদেরকে তার নিজ ঘরে সালাত আদায় করতে উৎসাহ প্রদান করেছেন ।সালাতের মত অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এক ফরজ ইবাদতের জন্য নারীদের ঘরে থাকাকে কে বেশি উৎসাহিত করা হয়েছে। সেখানে কিভাবে পারে নারীরা তাদের নিজেদেরকে আজকে ঘর থেকে বের করে বাহিরে প্রদর্শন করতে।

উপসংহার

আল্লাহ তা‘আলা নারী-পুরুষ উভয়কেই সম্মান দিয়েছেন, পুরুষের থেকে নারীকে ভিন্ন ভাবে দেখেননি। বরং যুগ যুগ ধরে অবহেলিত ও উপেক্ষিত নারী সমাজকে পুরুষের সমমর্যাদা এবং কোন কোন ক্ষেত্রে তার চেয়ে অধিক মর্যাদা দান করেছেন। এ প্রসঙ্গে মহান আল্লাহ বলেন, وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِيْ عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوْفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ‘স্ত্রীদেরও পুরুষদের উপর ন্যায় সঙ্গত অধিকার রয়েছে। আর নারীদের উপর পুরুষদের শ্রেষ্ঠত্ব রয়েছে’ (বাক্বারাহ ২২৮)।

ইসলাম নারীর প্রতি সকল প্রকার অত্যাচার, অবিচার নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছে। এটি আল্লাহ তাআলার নারীদের প্রতি অশেষ দয়া।আল্লাহ সুবহানাতায়ালা একজন নারীকে উচ্চ মর্যাদা দান করেছে নারীকে তার অবস্থা ভেদে বিভিন্ন রকমের সম্মান দিয়েছে এটি মহান আল্লাহ সুবহানাতায়ালার নারীদের প্রতি অশেষ রহমত।একজন নারী হিসেবে জন্ম লাভ করা এবং পরিপূর্ণ ইসলামের দীনকে পালন করা একজন নারীর দুনিয়া এবং আখিরাতের সাফল্য। আল্লাহ সুবহানাতায়ালা বিধবা তালাকপ্রাপ্ত নারীদের কথা চিন্তা করে ইসলামে তাদেরকে আবারো বিবাহ করার অনুমতি দিয়েছেন। এর ফলে নারীরা তাদের আশ্রয়স্থল খুঁজে পেয়েছে। আল্লাহ তাআলা সর্ব অবস্থায় সর্বক্ষেত্রে নারীদের জন্য অভিভাবক নিযুক্ত করে রেখেছেন ।নারীরা কখনোই অভিভাবক বিহীন থাকে না ।এই নিয়ম একমাত্র ইসলাম ধর্মেই রয়েছে। একজন নারী তার জীবনের প্রত্যেকটি পর্যায়ে অভিভাবকের দায়িত্বের ওপরে ন্যাস্ত থাকে। জীবনের সকল ক্ষেত্রে আর্থিক এবং সামাজিক বিষয়গুলোতে নারী থাকতে পারে নিশ্চিন্ত মনে ।এই থাকাটা নির্ভর করে একমাত্র ইসলামের সুশীতল ছায়ায়। একজন নারী কন্যা ,মা, স্ত্রী ও অন্যান্য সম্পর্কের ভিত্তিতে অত্যন্ত সম্মানী ও আত্মমর্যাদার অধিকারী। একমাত্র ইসলামই তাকে দিয়েছে এই অতুলনীয় মান সম্মান এবং অধিষ্ট করেছে সুমহান মর্যাদায়। ইসলাম নারীর সুরক্ষা কবজ যার ভেতরে সর্বক্ষেত্রে নারী সু -সুরক্ষিত অবস্থায় থাকে।

তথ্যসূত্র

অফলাইন থেকে

- ইসলামে নারীর মর্যাদা :মোহাম্মদ জাফরুল্লাহ খান
- নারীর অধিকার প্রতিষ্ঠায় ইসলাম :শাইখ আব্দুর রাজ্জাক
- ইসলামে নারীর অধিকার সেকেলে নাকি আধুনিক: ড. জাকির নায়েক
- মাসিক আল কাউসার :মিরাসে নারীর অধিকার
- মাসিক আত তাহরীক: নারীর অধিকার ও মর্যাদায় ইসলাম
- তাফসীর ইবনে কাসীর: আল্লামা ইবনে কাসির (রহ)
- নারীর অধিকার ও মর্যাদা: মাওলানা নুরুল ইসলাম অলিপুরী

অনলাইন থেকে সংগৃহীত তথ্য

- Wikipedia
- https://bn.wikipedia.org
- https://share.google/jmxttPGXdiKZWGU2s
- https://www.mmritbd.com/2023/06/Status-of-women-and-their-loss-of-dignity-in-Jahili-period.html?m=1
- https://share.google/b1gvIAOUoyCeB75w5
- https://muslimbangla.com
- https://www.hadithbd.com
- https://islamqa.info/en